যাঁহা হইতে এ চিত্রের প্রত্যেক বর্ণ পাইয়াছি—

প্রতিভাবান সাহিত্যিক—'নিয়তি' নাটক প্রণেতা—

অগ্রজ-প্রতিম স্নেহময় বান্ধব

শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন রায় চৌধুরী

মহাশয়ের

কর-কমলে ইহা উৎসর্গ করিলাম। ইতি—

শ্রীঅসিতারঞ্জন।

প্রেম-না-প্রবঞ্চনা !

পরেশের কথা।

(১)

"রোম্যান্স"—কথাটার তাৎপর্য্য ও মাধুর্য্য পঠদ্দশা হইতেই আমার মগজ অধিকার করে। কলিকাতার 'বয়াটে' ছাত্রদলের আমি ছিলাম একজন অন্যতম নেতা। কাহারও শাসনের ভয় করিতাম না। আশৈশব কলিকাতায় মামার বাড়ীতে বৃদ্ধ দাদামহাশয়ের অত্যধিক আদর ও আব্দারের মধ্যদিয়া লালিত হইয়া বড় হইয়া উঠিয়াছি। ছেলে বেলায় স্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার পর হইতে আমি খুব কমই দেশে গিয়াছি। বাবা ও মা দেশে থাকিতেন এবং মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া আমাকে দেখিয়া যাইতেন।

হিতাকাঙ্ক্ষী প্রতিবাসী প্রবীণেরা দাদামহাশয়ের নিকট রায় প্রকাশ করিতে লাগিলেন—'আমি একেবারে গোল্লায়

গিয়াছি।' দিন দিন তাঁহাদের ঐরূপ অতিরিক্ত হিতৈষণায় আমারও জিদ্ বাড়িয়া গোল্লায় যাওয়ার অবশিষ্ট পথটা সময়ে সময়ে প্রশস্ত ও সুগম করিয়া দিত। দাদামহাশয় নিজের রুগ্ন শরীর লইয়া তখন প্রায় বিছানাতেই থাকিতেন। আর আমিও নিতান্ত ছোট ছিলাম না, পরীক্ষায় প্রত্যেক বছরই পাশ করিয়া আসিতেছিলাম, সামান্য রকমের দুই একটা ধমক্ দেওয়া বা মিষ্ট ভর্ৎসনা ছাড়া তিনি আর কিছু বলিতেন না!

একবার—প্রায় বিশ বৎসর আগেকার কথা বলিতেছি—বৈশাখ মাসে এল্-এ পরীক্ষা সমাপনের অব্যবহিত পরেই মা ও বাবার বিশেষ আদেশে আমায় মনোহরপুর যাইতে হইল। নিতান্ত বিশ্রী অজ্ পাড়াগাঁ আমাদের এই মনোহরপুর। মেটে স্যাৎসেঁতে রাস্তা, চতুর্দ্দিকে জঙ্গল, ম্যালেরিয়ার ডিপো; রাত্রে আলো হাতে না লইয়া চলা যায় না! এমন কদর্য্য স্থানে রোম্যান্সের একটু গন্ধও থাকা সম্ভব নয়। থাকিবে কিরূপে? বর্ত্তমান উচ্চশিক্ষা ও সভ্যতার নিতান্ত অভাব সেখানে। পুরুষদের বিদ্যাবুদ্ধি মাম্‌লা মোকর্দ্দমা ও দলাদলির কূট কল্পনাতেই সীমাবদ্ধ; আর স্ত্রীলোকেরা—সকাল হইতে রাত্রি একপ্রহর পর্য্যন্ত গোবর ঘাঁটা, বাসন মাজা, জল তোলা, হাঁড়িঠেলা এবং ধানভানা প্রভৃতিতে

ব্যস্ত; পরিধেয় বস্ত্র গোবর, কাদা ও হলুদের সংমিশ্রণে একপ্রকার নূতন উৎকট বর্ণ ও বিকট বোট্‌কা গন্ধ উৎপাদন করিয়া বাতাসে নড়িয়া ধূলি উড়াইতেছে! এমন পাড়াগাঁয়ে আমার মত রেণল্ড্‌সের নভেল এবং সেলি বায়রণের কবিতা পড়া কলিকাতার শিক্ষিত যুবকের মন টিকিবে কেন? প্রাণ সর্ব্বদা পালাই পালাই ডাক ছাড়িতে লাগিল।

কিন্তু অদৃষ্ট ভাল হইলে ধূলাকণাও সোনাদানায় পরিণত হয়, এ হেন পাড়াগাঁয়েও একদিন আমার মন বসিয়া গেল!

সেদিন প্রাতঃকালে খিড়কীর পুকুরে হাতমুখ ধুইতে গিয়াছি। খুব ভোরে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। পিচ্ছিল ঘাটে হঠাৎ পা পিছলাইয়া অর্দ্ধজলে অর্দ্ধস্থলে অন্তর্জলির অবস্থায় পড়িয়া গেলাম। অমনি ঘাটের ওপারে রমণীর কলকণ্ঠে খিল্ খিল্ হাস্যধ্বনি উঠিল! বেদনায়, ক্রোধে ও লজ্জায় সেই কলরব আমার কর্ণে সুধাবর্ষণ না করিয়া যেন গলিত সীসক ধারার উষ্ণতায় প্রাণটাকে আরও তপ্ত করিল। এই সময়ে এমন হাসিতে পারে এতবড় স্পর্দ্ধা—প্রগল্‌ভতা কাহার আছে—দেখিবার জন্য ধীরে ধীরে উঠিতে উঠিতে ভ্রুকুটী-বিকৃত-বদনে তৎপ্রতি চাহিলাম, কিন্তু যাহা দেখিলাম—বেদনা, লজ্জা ও ক্রোধ তন্মুহূর্ত্তে কোথায় পলাইল, বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম—এই অনিন্দ্য সুন্দরী ষোড়শী বালিকা কে?

প্রেম-না-প্রবঞ্চনা।

আমার রোম্যান্স্ মিলিল,—পঙ্কেইত পদ্ম ফোটে!

রসিক তাঁতির বয়স তিনকুড়ির কানায় কানায় হইলেও প্রাণের রস তাহার তখনও শুকায় নাই। সেই বয়সেও অনেক অর্থ ব্যয়ে এই ষোড়শী গৌরাঙ্গীকে গৃহে আনিয়া "যথারণ্যং তথা গৃহং" অপবাদ তৃতীয়বার মোচন করিয়াছিল। রসিক আমাদের প্রজা, খিড়কীর পুকুরের ওপারেই তাহার বাড়ী।

. সেদিন হইতেই রসিকের বাড়ী আড্ডা ফাঁদিলাম। তাহার নিকট তাঁত্ শিক্ষার অছিলায় একনিষ্ঠ ছাত্রের ন্যায় প্রত্যহ তাহার তাঁত্‌শালায় হাজির হইয়া বিশ-পঁচিশ ছিলিম গুড়ুক ধ্বংস করিতাম, আর সেই গুড়ুক রসিকের ষোড়শী রূপসী হাসিতে হাসিতে তাহার সুন্দর হাতের মিষ্ট রসান্ দিয়া সাজিয়া দিত।

রসিকের ঘর মোটের উপর দেড়খানি; আধখানি রান্নার, একখানি বাসের ও ব্যবসার; উলুর চাল, মাটীর দেওয়াল। বড় ঘরের দাওয়া বেড়ায় ঢাকা, এই স্থানে তাঁত্ বসান হইয়াছে। আমি ঐ স্থানে রসিকের পাশে বসিয়া তাহার তাঁত্‌বুনা দেখিতাম, আর কলিকাতার বহু বিচিত্রতার নানা গল্প বলিতাম; রসিকের খুব ভাল লাগিত। দিনে দিনে আমি তাহার অতি প্রিয় হইয়া উঠিলাম, বাড়ীর কলাটা কাঁঠালটা পাকিলে আগে আমারই ভোগে লাগিত, হাজিরায় কোনদিন বিলম্ব হইলে কৈফিয়ত দিতে হইত।

রসিকের একমুখে তাহার এই তৃতীয়া-তরুণীর গুণের ব্যাখ্যা আর ধরিত না। প্রেয়সীর সেবা, যত্ন ও বুদ্ধিমত্তার এক একটা উদাহরণ বিশ বার বলিয়াও রসিকের সাধ মিটিত না। ব্যবসায়ের হিসাব ঠিক রাখিতে, চিঠিপত্রটা পড়াইতে বা কোথাও লিখিতে তখন আর অন্যের তোষামোদ প্রয়োজন হইত না; এমন কি, পত্রগুলির শিরোনামা হিরণ ইংরাজীতে লিখিত!

হিরণের লজ্জা ছিল না। গ্রাম্য মিশনারী স্কুলের গুরু-মা মেমসাহেবের কৃপায় কুসংস্কারের অন্ধকার তাহার কাটিয়া গিয়াছিল। আমার সম্মুখে অনায়াসে সে বাহির হইত, আমার সহিত কথা কহিত, হাসিত, আমার গল্প শুনিতে ভালবাসিত; দিব্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চতুরা মেয়ে সে।

তরুণী রূপে ও গুণে রসিকের গৃহ ও প্রাণ আলো করিয়াছে। সে আলোকে আমিও বঞ্চিত হইলাম না। এক একটী গোপন কটাক্ষে আমাকে লইয়া সে যেন কোন্ স্বপ্নরাজ্যে উধাও হইত!

এত যে বয়াটে আমি, কিন্তু প্রেমের পাঠশালায় তখনও আমার হাতে খড়ি হয় নাই। ক্রিকেট, টেনিস, ফুটবল, সভাসমিতি, বনভোজন প্রভৃতি লইয়া এতদিন কাটাইয়াছি; এই নূতন স্বপ্নে বুক দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। মনে মনে বুঝিতাম—মহা অন্যায় করিতেছি, হিরণের দিকে চাহিবার

আমার অধিকার কি? মনের ভাব রসিক বুঝিতে পারিলে—ছি ছি,—সে আমায় ভালবাসে, আদর করে, যত্ন করিয়া খাওয়ায়, বিশ্বাস করিয়া ঘরে বসাইয়া কাজ শিখায়! তথাপি কি দুর্ব্বল মন! হিরণের পদশব্দ শুনিলেই প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিত, তাহার হাসিটি দেখিবার লোভ সামলাইতে পারিতাম না, মন বিবেকের বিদ্রোহী হইত! প্রত্যহ প্রভাত হইলেই হিরণের মুখখানি মনে পড়িত, কতক্ষণে রসিকের দাওয়ায় হাজির হইব—ভাবিয়া ব্যস্ত হইতাম। কিন্তু ঐ দর্শন পর্য্যন্তই ছিল আমার শেষ সীমা, ইহার অতিরিক্ত কিছু ধারণা করিবার সাহস তখন পর্য্যন্ত আমার হয় নাই।

রসিকের যত্নে বয়নবিদ্যা কতকটা আমার আয়ত্ত হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে একজোড়া গামছা বুনিয়া বাবাকে দিয়াছি, মায়ের জন্য আর একজোড়া আরম্ভ করিয়াছি—শেষ হইতে অল্পই বাকী আছে। তাড়াতাড়ি বাকী কাজটুকু সারিবার জন্য একদিন দ্বিপ্রহরে রসিকের বাড়ী আসিলাম। রসিক হাটে যাইতেছিল, কিছু চাউল এবং সূতা আনিবে। আমার 'তামাক পেসাদ্' পাইয়া সে রওনা হইল, আমিও ঠকাস্ ঠকাস্ সুরু করিলাম।

কিছুক্ষণ মনোযোগের সহিত পরিশ্রম করিয়া বয়ন প্রায় শেষ করিয়াছি, গা দিয়া ঘাম ঝরিতেছে, এমন সময়ে হিরণ

আসিয়া পশ্চাৎ হইতে আমায় মৃদু ধাক্কা দিয়া বলিল—“থাক্, আর বুনিয়া কাজ নাই।”

আমি তাহার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলাম— “কেন?”

হিরণ বলিল—“আপনি তামাক খান্, অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন, আমি ততক্ষণ বাকী কাজটুকু সারিয়া দিতেছি।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“তুমি কি বুনিতে পার?”

হিরণ হাসিয়া উত্তর করিল—“পারি না? তাঁতির ঘরের মেয়ে, এ কাজ কি কাহারও কাছে শিখিতে হয়?”

আমি বলিলাম—“তোমার পরিশ্রম হইবে না?”

হিরণ বলিল—“তা হোক, আমরা মেয়ে মানুষ, আমাদের সব সয়।”

আমি বলিলাম—“তোমাদের তাঁতির ঘরের মেয়েদের ত তাঁত্ বুনিতে নাই।”

ঈষৎ হাস্যে হিরণ উত্তর করিল—“আমি ওসব মানি না।”

হিরণের নিতান্ত আগ্রহে অগত্যা তাঁত্ ছাড়িয়া উঠিলাম, সে বসিয়া গেল; আমি নিকটেই একটী শীতল পাটীর উপরে বিনা উপাধানে শুইয়া পড়িয়া তাহার বয়ন-নৈপুণ্য দেখিতে লাগিলাম।

আকাশের ঘন মেঘে কখন সূর্য্য ঢাকিয়া গিয়াছিল আমার সেদিকে লক্ষ্য ছিল না, হঠাৎ খুব জোরে এক পশলা বৃষ্টি নামিল,

বাদল হাওয়ায় আরাম পাইয়া আমি কোন্ সময়ে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

হঠাৎ কাহার কোমল স্পর্শে ও উষ্ণ নিঃশ্বাসে সজাগ হইয়া চক্ষু মেলিলাম, দেখিলাম—হিরণ,—আমার অতি নিকটে, আমার মুখের কাছে তাহার মুখ! সত্য—না—স্বপ্ন! স্তম্ভিত হইয়া তাহাকে শুধু দেখিতে লাগিলাম।

আর বাকী রহিল না—হিরণের উষ্ণ-অধর আমার অধর স্পর্শ করিল!

আমি শিহরিয়া মুখ ফিরাইলাম, বড় রাগ হইল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিতেই সম্মুখের দরজায় দেখিলাম—রসিকের জ্বলন্ত চক্ষু দুইটী একদৃষ্টে আমাদের দেখিতেছে!

আমিও রসিকের দিকে চাহিয়া আছি, দৃষ্টি নামাইতে সাহস পাইতেছি না, সকলেই নীরব, রসিকের চক্ষুকোণে বিজলী খেলিল, আমার চক্ষু হইতে জলধারা নামিল!

* * * *

(২)

পৃষ্ঠে কেহ বেত্রাঘাত করিলেও বুঝি আমার তত কষ্ট বা দুঃখ হইত না, ইহাপেক্ষা তন্মুহূর্ত্তে মৃত্যু হইলেই যেন আমার ভাল হইত।

কিছুক্ষণ ঐভাবে থাকিয়া রসিকের চক্ষুও ক্রমে আর্দ্র হইয়া উঠিল এবং কোন কথা না বলিয়া এক পাঁজর-ভাঙ্গা করুণ দীর্ঘনিঃশ্বাসে আমার বক্ষস্থল কাঁপাইয়া সে গৃহ হইতে কোথায় বাহির হইয়া গেল। চিত্র-পুত্তলিকামত নির্ব্বাক দাঁড়াইয়া তাহার সেই ভাব দেখিলাম; তাহার প্রস্থানের পর আমিও আর হিরণের দিকে ফিরিয়া না চাহিয়া ধীরে ধীরে নতমস্তকে সে বাড়ী হইতে চলিয়া আসিলাম।

সেইদিন সন্ধ্যার গাড়ীতেই মনোহরপুর ত্যাগ করিলাম। বাবা ও মাকে বলিলাম—কোন সহপাঠী বন্ধুর নিমন্ত্রণে কলিকাতায় যাইতেছি।

এল-এ পরীক্ষার ফল আমার বাড়ী থাকা সময়েই প্রকাশ হইয়াছিল, আমি প্রথম বিভাগে পাশ হইয়াছি। পিতা স্থির করিয়াছিলেন—এইবার আমায় শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়াইবেন, আমারও সেইদিকে খুব ঝোঁক। কলিকাতায় আসিয়া তাহার আয়োজনে মনোযোগী হইলাম এবং অল্পদিন

মধ্যেই কলেজে ভর্ত্তি হইয়া তৎসংবাদ পিতা মাতাকে লিখিলাম, আর দেশে গেলাম না। কর্ত্তব্যের গণ্ডীমধ্যে আপনাকে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া রসিক ও হিরণকে ভুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কলিকাতার প্রতিবাসিগণ আমার স্বভাবের অকস্মাৎ পরিবর্ত্তন এবং আমাকে এইরূপ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ দেখিয়া বিস্মিত ও সন্তুষ্ট হইলেন।

পাঁচ ছয় মাস পরে—কলেজের ছুটিতে কলিকাতায় মাতুলালয়ে আছি—একদিন দ্বিপ্রহরে হঠাৎ হিরণ আসিয়া উপস্থিত! সঙ্গে কেহ নাই, এক বস্ত্রে আসিয়াছে। শুনিলাম—রসিকের বুকে বজ্রাঘাত করিয়া সর্ব্বনাশী পলাইয়া কলিকাতায় আসিয়াছে।

হিরণ আমার আশ্রয় চায়, শুধু আশ্রয় নয়—আমায় চায়, আমারই ভরসায় সে কলিকাতায় আসিয়াছে;—এ কি কথা! এই আকস্মিক ঘটনায় আমি কি করিব ভাবিয়া উঠিতে পারিলাম না, অবাক্ হইয়া তাহাকে দেখিতে লাগিলাম;—বড় বড় চক্ষু দুইটী তাহার টলটলে জলে ভরা—আমারই করুণার প্রত্যাশী হইয়া কাঁদিতেছে—যেন বলিতেছে—আমি ভিন্ন জগতে তাহার আর কিছুই আকাঙ্ক্ষিত নাই; বায়ু-কম্পিত গোলাপ পাঁপড়ির মত রাঙ্গা ঠোঁট দু'খানি উৎকণ্ঠায় কাঁপিতেছে—যেন তাহার বুক ভরা কথাগুলি আমায় বলিতে চায়; প্রতি নিঃশ্বাস

প্রশ্বাসে উন্নত বক্ষ উঠিতেছে—নামিতেছে, যেন বলিতেছে—ওগো, তুমি এস, তোমার কঠিন স্পর্শে আমার এই কোমল বক্ষের দুর্দ্দমনীয় স্পন্দন প্রশমন কর—আমি বড় নিরাশ্রয়।

কিন্তু তাহাও কি সম্ভব? হউক না সে নিরাশ্রয়া, থাক্ না তাহার বাসন্তী গোলাপের মত ফুটন্ত যৌবন; রূপের প্রলোভনে পড়িয়া একটা কুলটার কাতরতায় কি সমাজ, সংসার, নিজের ইহ-পর-কাল এবং মনুষ্যত্ব জলাঞ্জলি দিতে পারি? রূপ যৌবন কিছুইত স্থায়ী নয়—দুদিনের মধ্যে ফুলের মতই ঝরিয়া পড়িবে!

মনে হইল—হিরণ মানুষী নয়, সৌন্দর্য্যের ছলনায় রাক্ষসী; হৃদয় তাহার পবিত্র নয়—নরকের বিষ্ঠাকুণ্ড; বিশ্বাস-ঘাতিনী একজনকে মজাইয়াছে, আবার আমার সর্ব্বনাশের ফাঁদ পাতিয়াছে!

এই সময়ে রসিকের সেই চক্ষু দুইটী আমার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়া আমার সংকল্প আরও দৃঢ় করিল।

পরিধেয় আধ ময়লা কাল’পাড়ের সাড়ীখানি ভিন্ন সঙ্গে তাহার আর কিছুই দেখি নাই, একখানি অলঙ্কারও নয়, হাতে মাত্র কয়গাছি কাচের চুড়ি। টাকাকড়ির প্রয়োজন আছে কি না, কিছু খাইবে কিনা, কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিলাম না,

সেই দ্বিপ্রহরে বাড়ীর ফটক হইতে তৎক্ষণাৎ তাহাকে নিষ্ঠুর বাক্যে বিদায় দিয়া আমি উপরে উঠিয়া আসিলাম।

রসিক যদি সেদিনের সেই ব্যবহার নীরবে সহ্য না করিত, তাহা হইলে আজ আমি হিরণের উপর এত কঠিন হইতে পারিতাম কি না সন্দেহ।

* * * * * *

হিরণের কথা।

(৩)

প্রণয়—প্রেম—ভালবাসা—এ সকল কেবল কথার কথা, মনের বিকার—পাগলের প্রলাপ; প্রেমের নামে সংসার জুড়িয়া কেবল প্রবঞ্চনার কেনাবেচা চলিতেছে, মূলে—আত্মসুখ, স্বার্থ!

পাড়াগাঁয়ের মিসনারী স্কুলের গুরু-মা মেম্‌সাহেবের কাছে বিলাতী ঢংএর শিক্ষায় বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া এখন কি—

মাতাপিতার কৃতকার্য্যকে স্নেহ বলিব!—কেন? নিজেদের সুখ স্বচ্ছন্দতার তুলনায় আমার জীবনের কোন মূল্য আছে—একথা তাঁহারা ভাবেন নাই। আমার বিনিময়ে তাঁহারা রসিক তাঁতির টাকার তোড়াকে হাসিমুখে বরণ করিয়া ঘরে তুলিয়াছেন!

বৃদ্ধ তাঁতির ইন্দ্রিয়পরায়ণতাকে পবিত্র-প্রেম বলিতে হয়—তোমরা বল, আমি বলিব না। আপনার স্বার্থে উন্মত্ত হইয়া সে আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। আমি কেন তাহার মুখ চাহিয়া তাহার দাসীত্ব স্বীকার করিয়া নিজের জীবনের সুখ শান্তি নষ্ট

করিব? সে আমার কে? আমার ত বিবাহ হয় নাই, হইয়াছিল—বিক্রয়।

সকলেই আপনার লইয়া ব্যস্ত, পরের জন্য কেহই পড়িয়া থাকিতে চাহে না, আমিই বা থাকিব কেন?

হঠাৎ পরেশবাবুকে দেখিয়া আমার নবীন প্রাণের রুদ্ধ বাসনা জাগিয়া উঠিয়াছিল, রূপের ফাঁদে তাঁহাকে ধরিলাম, কিন্তু রাখিতে পারিলাম কৈ!

হায়রে কপাল! পিতা মাতার স্নেহ-আদরকে স্বামীর ঘরে পড়িয়া শত্রুতাই মনে হইয়াছিল। পিতা আদর করিয়া ভাতের কাঠির বদলে আমার হাতে কলম দিয়াছিলেন—স্বামীর ঘরে উনানে ফুঁ পাড়িয়া চক্ষের জলে ভাসিয়াছি! বাপের বাড়ী শীতের দিনে বেশী বেলা না হইলে মা বিছানা ছাড়িতে দিতেন না—কিন্তু শ্বশুর বাড়ীতে পৌষের ঊষায় পচা গোবরে ঘর নিকাইয়া দুই হাত অবশ হইয়া গিয়াছে! বর্ষায় ভিজিয়া বাসন মাজিয়া সাতদিনে মাথার চুল শুকায় নাই! আমার সুখের কথা আর কত বলিব!

মনে পড়ে—পরেশবাবু যেদিন আমাদের বাড়ী ত্যাগ করিয়া গেলেন! রাত্রি অনেক হইল—স্বামী ঘরে ফিরিলেন না। সে বাড়ী ঘড়ীর চলন ছিল না, শৃগালের ডাকে রাত্রি নির্ণয় করিতাম। শৃগালদের প্রথম প্রহরের সাড়া শেষ হইল, তখনও

বৃদ্ধের দেখা নাই, বুঝিলাম—রাগ করিয়া গিয়াছে। কেন, রাগ কিসের? যদি একটা অপরাধ করিয়াই থাকি, যাহা ইচ্ছা আমার মুখের উপর বলিলেই হইত, বেশত—একটা চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া যাইত। কিন্তু সেরূপ মনের জোর বৃদ্ধের ছিল না।

তাহার জন্য ভাত বাড়িয়া রাখিলাম, আমি কিছুই খাইলাম না। প্রদীপ না নিবাইয়া, দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িলাম। ঘুম আসিল না, মন বড় অস্থির—কি হয়। আকাশ পাতাল ভাবিতেছি, সহসা দরজায় করাঘাতের শব্দে চমকিয়া উঠিয়া শুনিলাম—"দরজা খুলিয়া দাও।"

বুঝিলাম—বৃদ্ধ আসিয়াছে, স্বর বড় গম্ভীর—বিরক্তিপূর্ণ! তাড়াতাড়ি উঠিয়া কপাটের খিল খুলিয়া আবার শয্যার আশ্রয় লইয়া আঁচলে মুখ ঢাকিলাম। সে গৃহে আসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল; কিন্তু কোন কথা নাই, চোরের মত চুপ্ করিয়া আছে। মধ্যে মধ্যে তাহার দুই একটা দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ মাত্র কানে আসিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সে আহার করিল, তারপর পানতামাকে ভালরূপ মস্‌গুল্ হইয়া ব্যঙ্গস্বরে আমায় সম্ভাষণ করিয়া বলিল—"বৃদ্ধে ত আর রুচি নাই—বুঝিলাম, কিন্তু আমার ভাতে অরুচি কবে হইতে হইল?"

কানে আমার যেন বিষের ছিটা পড়িতেছিল, দুই তিন

বার বলায় কোন উত্তর করিলাম না, পরে বিরক্তস্বরে বলিলাম—"অত ঠাট্টা কেন? তোমার ভাত আর আমি খাইব না।"

বৃদ্ধ বলিল—"মজা মন্দ নয়! দোষও করিবে, আবার চক্ষুও রাঙ্গাইবে?"

আমি ঝাঁঝিয়া উঠিলাম—"দেখ, বেশী কথা বলিও না, তোমার শেষ কথা একেবারে বলিয়া ফেল।"

বৃদ্ধও সপ্তমে চড়িয়া বলিয়া উঠিল—"বটে! বাহির হও আমার ঘর হইতে, এই দণ্ডে দূর হও।"

"বেশ, এখনি যাইতেছি" বলিয়া তৎক্ষণাৎ শয্যা হইতে উঠিয়া আঁচলের চাবির তোড়া তাহার সন্মুখে ফেলিয়া দিয়া সজোরে দরজা খুলিলাম। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় যাইবে?"

আমি বলিলাম—"জাহান্নামে। কোথায় যাইব—তোমার জানিবার ত প্রয়োজন নাই, আর কোথাও স্থান না হয়—যমের বাড়ী আছে।"

বলিয়া যেমন আমি দরজার বাহিরে পা দিয়াছি, অমনি সে উঠিয়া আসিয়া আমার হাত ধরিয়া বলিল…"রাগ করিলে হিরণ!"

বৃদ্ধের দৌড় আমি জানিতাম, তাহার ভাব দেখিয়া হাসি পাইল, বলিলাম—"কেন, আবার কেন?"

সে বলিল—"কারণ আছে, ঘরে চল, বলিতেছি।"

আমি বলিলাম—"তোমার ঘর আর আমি করিব না।"

সে বলিল—"ঘর কর না কর, একবার শোনই না ?"

সে হাত ধরিয়া আমায় ঘরে ফিরাইয়া লইয়া গেল, তারপর ধীরে ধীরে বিছানায় বসিয়া বলিতে লাগিল—

"ভাবিয়া দেখিয়াছ কি—পরেশবাবু যে তখনই কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন ?"

আমি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। সে আবার বলিতে লাগিল—"তিনি আমার বাড়ী আসিতেন, অনেকেই জানে ; এই অবস্থায় তুমিও আজ গৃহত্যাগ করিলে দুর্নাম রটিবে না ?"

আমি বলিলাম—"বুঝিয়াছি, আর বলিতে হইবে না।"

সে বলিল—"শুধু তাহাই নয়, আরও আছে ; জান ত—কর্ত্তামহাশয় বেজায় রাগী, তোমাদের জন্য আমায় ভিটাছাড়া করিবেন।"

আমি ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়া উঠিলাম—"তাহার উপর—হাজার টাকা পণে তুমি আমায় কিনিয়াছ, বৃদ্ধকালে সে টাকার সুদ আসল আদায় না করিয়া ছাড়িবে কি ? বেশ, যাহাতে পরেশবাবুর দুর্নাম না হয়, আর তোমারও ভিটা বজায় থাকে, সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়াই তবে আমি যাইব" বলিয়া একটা মাদুর লইয়া ঘরের এক পার্শ্বে শুইয়া পড়িলাম।

পাঁচ ছয় মাস কি রকমে কাটিয়াছে—অন্যকে তাহা বলিয়া বুঝাইবার উপায় নাই। একা একা ভাবিতাম, কাঁদিতাম, আর যে সমস্ত কার্য্য নিতান্ত না করিলে নয় তাহাই করিতাম। মনে পড়িত—পরেশবাবুর গল্প। আহা—কলিকাতা কিরূপ—কেমন স্থান! পরেশবাবু বলিয়াছেন—সেখানে নিজের রান্না না করিলেও খাবার মিলে, গোবরে ঘর নিকাইতে হয় না; সেখানকার সমস্ত বিচিত্রতা ও রহস্যের কথা সত্য কি না একবার প্রত্যক্ষ দেখিতে সাধ হইত! মনে মনে কত কল্পনার কুসুম সৃষ্টি করিয়া আপনাতে আপনি বিভোর হইয়া থাকিতাম! অবশেষে একদিন স্থির করিলাম—কলিকাতায় যাইব—পরেশবাবু সেখানে আছেন।

কিন্তু আমার কল্পনা কুসুম ছিন্নভিন্ন হইল, এতদিনের আশার মাথায় বাজ পড়িল,—নিষ্ঠুর পরেশ আমায় আশ্রয় দিল না, শয়তানী সম্বোধনে উপেক্ষা করিয়া দরজা হইতে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিল!

উঃ! সেদিনের কথা মনে হইলে আজও প্রাণ কাঁপিয়া উঠে! বেলা তখন তৃতীয় প্রহর, ক্ষুধা পিপাসায় বুক ফাটিয়া যায়, মাথার উপর রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করে, পায়ের তলায় কলিকাতার অপরিচিত ও তপ্ত পাথরের রাস্তা, হাতে একটীও পয়সা নাই; যত আশা করিয়া পরেশবাবুর সহিত সাক্ষাৎ

করিয়াছিলাম, তাঁহার প্রত্যাখানে ততোধিক মর্ম্মাহত হইয়া, কোথায় যাইব—কি করিব—কিছুই ভাবিয়া না পাইয়া যেদিকে দুই চক্ষু যায় হন্ হন্ করিয়া চলিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ চলিবার পর দেখিলাম—সম্মুখে নদী, কত লোকজন, নৌকা, ষ্টীমার অসংখ্য! শুনিয়াছিলাম—কলিকাতায় গঙ্গা আছে, বুঝিলাম ইহা তাহাই বটে। ভক্তি অপেক্ষা উত্তাপের তীব্রতা অধিক অনুভব হওয়ায় স্নান করিতে বড় ইচ্ছা হইল। কিন্তু পরিধেয় একখানি বস্ত্র মাত্র,—ভিজাইলে উপায়? ভিজা কাপড়ে থাকিব—তবু একবার স্নান না করিলে সুস্থ হইবনা ভাবিয়া জলে নামিলাম।

কত লোক স্নান করিতেছে; ঘাটের একদিকে পুরুষ, অন্যদিকে স্ত্রীলোক; বালকগুলি অল্প জলে ডুব-সাঁতার খেলিতেছে, ছুটাছুটী—মারামারি করিতেছে। ঘাটের একদিকে একটা দালানের সহিত প্রাচীর ঘেরা কতকটা তীরভূমি হইতে ধূম নির্গত হইতেছে—মানুষ-পোড়া দুর্গন্ধে নাক পাতা ভার।

বহু স্ত্রীলোকের মধ্যদিয়া আমিও আবক্ষ জলে নামিলাম। একদল যুবক অনেকদূর সাঁতার কাটিয়া প্রায় মাঝ গঙ্গায় গিয়াছিল, এই মাত্র ফিরিয়াছে। আমাদেরও বাড়ীর নিম্নে নদী, ছেলে বেলায় সাঁতার শিখিয়াছিলাম। ইচ্ছা হইল—সাঁতার দিয়া ওপারে যাইয়া দেখিব—সেখানে কি আছে। কিন্তু

পাড়ি দেখিয়া বুক একবার কাঁপিয়া উঠিল,—দেশের সে নদীর চেয়ে এ নদী অনেক বড়। তা হৌক, কি আর হইবে—না হয় মরিব, বাঁচিয়াই বা কোন্ সুখে আছি! মরিলে—কল্লোলিনীর শীতল কোলে জ্বালা জুড়াইব।

তাহাই করিলাম—মাথার কাপড় কোমরে বুকে ভাল রকম জড়াইয়া—চুল কসিয়া বাঁধিয়া প্রবল তরঙ্গ তুচ্ছ করিয়া সাঁতার দিলাম। অন্যান্য স্নানার্থীরা আমার এই বিক্রম দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল; আমি অনেক দূর গিয়াছি, অনেকের দৃষ্টি আমার উপর পড়িয়াছে; কেহ আমায় মন্দ বলিতেছে, কেহ বা আমার মরণা-শঙ্কায় ভীত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে আমায় সাবধান করিতেছে, কেহবা স্পষ্ট বাক্যে ব্যঙ্গ করিতেছে। আমি কাহারও কথায় না ফিরিয়া বরং আরও জেদের সহিত সম্মুখে অগ্রসর হইলাম।

অনেকদূর আসিয়াছি। প্রবল স্রোত, স্রোতের বিপরীতে একচুলও অগ্রসর হইবার সাধ্য নাই, স্রোতের সঙ্গে ভাসিয়া চলিয়াছি; কিন্তু আর পারি না, গা যেন ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। এমন সময়ে প্রবল ঢেউ তুলিয়া একখানি ষ্টীমার চলিয়া গেল, তীরের দিক হইতে শব্দ আসিল—“গেল—গেল!”

তখন ফিরিবারও আমার সাধ্য নাই,—গা এলাইয়া পড়িয়াছে, তদুপরি আরও বিপদ—বাঁধা চুল রাশি খুলিয়া যাইয়া স্রোতে ভাসিয়া আমার নাক মুখ ঢাকিয়া ফেলিতেছে, বারম্বার তাহা

সরাইব কিম্বা আবার বাঁধিয়া লইব—এমন সামর্থ্যও তখন বাহুতে নাই, মধ্যে মধ্যে এক এক ঢোক জল মুখে ও নাকে প্রবেশ করায় ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত জ্বলিতেছিল, আর চলিতে পারি না, স্রোতের গতিতে গা ঢালিয়া—কখনও ডুবিয়া, কখনও ভাসিয়া বহিয়া যাইতেছি, মধ্যে মধ্যে জলের ঝাপটায়—দম বন্ধ হইয়া আসে। দৃষ্টি অন্ধকার—দারুণ ত্রাস—আর রক্ষা নাই—বুঝি এখনি ডুবিব!

সহসা চুলে টান পড়িল, মাথা জাগাইয়া চাহিয়া দেখি—একটী পুরুষের মুখ! চুল ছাড়িয়া তিনি আমার হাত ধরিলেন, বলিলেন—"ভয় নাই, এস, এই বয়াটা ধরি"।

আমায় লইয়া তিনি নিকটস্থ একটী বয়ার শিকল ধরিলেন। আমারও তখন দেহে বল আসিল, আমিও শিকল ধরিলাম। তারপর তিনি আপনি বয়ায় উঠিয়া আমাকেও হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিলেন, আমি তাঁহার গায়ের উপর হেলিয়া পড়িলাম, তিনি একহাতে আমায়, আর একহাতে বয়ার চূড়ার লোহার আংটা ধরিয়া রহিলেন, পরে বলিলেন—"কে তুমি—এমন দুঃসাহস কেন করিলে?"

আমার তখনও ঘন ঘন শ্বাস বহিতেছে, কথা কহিতে পারিতেছি না, কেবল তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম। বয়স তাঁহার পঁচিশের উপর, অতি সুন্দর বলিষ্ঠ শরীর, গৌরবর্ণ; কাল

ও চিকণ গোঁফে মুখখানি দেখিতে সুশ্রী, দুই কাণে চকচকে দু'টী হীরার ফুল, বাহুতে সোণার তাগা।

আমি কতকটা সুস্থ হইলে তিনি আবার বলিলেন—"এমন কাজ কেন করিলে—কে তুমি? তোমার কি মরণের ভয় নাই?"

আমি ধীরে ধীরে বলিলাম—"মরণের পথেই ত' চলিয়াছিলাম।"

তিনি বিস্মিত স্বরে প্রশ্ন করিলেন—"সে কি! মরিবে কেন? তোমার এই অল্পবয়স, এমন পরীর মত রূপ, কি দুঃখে তুমি মরিতে চাও?"

এত কষ্টেও আমার হাসি পাইল! বলিলাম—"রূপযৌবন থাকিলেই কি দুঃখ দূর হয়?"

তিনি বলিলেন—"হয় বৈকি, যাহার এমন রূপযৌবন আছে, জগতে তাহার অভাব কিসের?"

"অভাবের অন্ত নাই, পৃথিবীতে আমার দাঁড়াইবার স্থান নাই।"

"বল কি! তোমার আর কে আছে?"

"কেহ নাই!"

"বাড়ী কোথায়?"

"অনেক দূর!"

"কলিকাতায় নয়?"

"না!"

"এখানে কবে আসিয়াছ?"

"আজই—এই প্রথম!"

"কেন আসিলে?"

"দেখিতে,—এই পোড়া রূপযৌবনের কেহ আদর করে কি না!"

"কি দেখিলে?"

"দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিল, একদিনেরও আশ্রয় পাইলাম না।"

"আমার ঘরে চল না—আমি তোমায় চিরজীবন আশ্রয় দিব, যাইবে?"

"না!"

"কেন?"

"বিশ্বাস হয় না।"

"ভাল, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ, অবিশ্বাস হয়,—গঙ্গা ত আছেই।"

"তোমার ঘরে যিনি আছেন, তাঁহার আপত্তি হইবে না?"

"সে চিন্তা করিও না, আমারও কেহ নাই। তোমার নাম?"

"হিরণ কুমারী!"

"আমার নাম—কিশোরী লাল।"

অনেক দূরে একখানি পান্‌সী দেখিয়া মাঝিকে তিনি ডাকিলেন, মাঝি নৌকা লইয়া আসিল, আমরা উঠিলাম। যে ঘাট হইতে জলে নামিয়াছিলাম, সে ঘাটে না গিয়া অন্য এক ঘাটে নৌকা বাঁধিল, সম্মুখে নদীর উপর প্রকাণ্ড এক পুল দেখিলাম—পুলের উপর দিয়া কত গাড়ী, ঘোড়া, লোক চলিতেছে! তীরে উঠিয়া ভিজা কাপড়ে সেখান হইতে ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া বড় রাস্তার উপরের একখানি মস্ত বড় বাড়ীর সম্মুখে আমরা নামিলাম।

নিরাশ্রয়ে অন্ধকার দেখিয়া গঙ্গায় নামিয়াছিলাম, পতিত-পাবনী আমায় কোলে স্থান দিলেন না, নূতন পথের নূতন আলোক দেখাইয়া আমায় ভুলাইয়া দিলেন! ভাবিলাম,—ভাল, দেখা যাউক—এ পথের শেষ কোথায়।

* * * *

(৪)

কিশোরীলাল ভাগ্যবান পুরুষ, বোম্বাই নিবাসী স্বর্গগত রত্নেশ্বর শ্রেষ্ঠীর পোষ্যপুত্র। জঘন্য কৃপণতায় জীবন যাপন করিয়া কাপড়ের ব্যবসায় উন্নত ঐশ্বর্য্যে রত্নেশ্বর শ্রেষ্ঠী বোম্বাই সহরের একজন ধনকুবের নামে পরিচিত ছিলেন। শুধু বোম্বাই নয়—কলিকাতা, রেঙ্গুন এবং আরও অনেক সহরে উহাদের কার-বার ও বাড়ী আছে। কিশোরীলাল এক রাজ-ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী।

প্রথম রাত্রে ভাঙের নেশাটা একটু জমিয়া উঠিতেই তাঁহার প্রাণের কপাট খুলিয়া যাইয়া মনের কথা সমস্তই বাহির হইয়া পড়িল। তাঁহার মাতাও জীবিত নাই, কেহ নাই, আছে কয়েকজন বিশ্বাসী কর্ম্মচারী এবং একদল ইয়ার। পিতার মৃত্যুর পর হইতে বিষয়কার্য্য সমস্তই তাঁহার নিজের মাথায় পড়িয়াছে।

প্রকাণ্ড বাড়ী, চারতলার উপরে নিজের শয়নগৃহে আমায় দুইদিন রাখিয়া পরদিন বৈকালে তিনি আমায় মোটরে উঠাইয়া সহর-পল্লীর গঙ্গাতীরস্থ তাঁহার এক নির্জ্জন ও সুন্দর বাগানে লইয়া গেলেন।

আমাকে লইয়া তিনি বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সদাই চিন্তা—কিসে আমি সুখী হইব। তিনি অশিক্ষিত বা হৃদয়হীন ছিলেন না—কিন্তু বড় সৌখীন ও সৌন্দর্য্য-প্রিয় ছিলেন। নিত্য নূতন সাজে আমায় সাজাইয়া পাশে বসিয়া দেখিতেন, আমায় লইয়া যেন পুতুল-খেলা খেলিতেন। নিজে খুব গান ভাল বাসিতেন, কিন্তু গাহিতে পারিতেন না, অল্প সল্প তবলা বাজাইতে জানিতেন; আমার সঙ্গীত শিক্ষার জন্য সুবিজ্ঞ ওস্তাদ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আমারও বাল্যকাল হইতে সঙ্গীতে অনুরাগ ছিল, সুযোগের অপব্যয় করিলাম না। আপনার প্রতিভা এবং ওস্তাদজির সাহায্যে উন্নতিলাভ করিয়া কিশোরীলালকে অতিশয় সন্তুষ্ট করিলাম। দাসদাসী পরিবৃতা হইয়া আড়ম্বরের সহিত দুইবৎসর কাটিল। এই সময়ে কিশোরীলালকে কার্য্যোপলক্ষে বোম্বাই মোকামে যাইতে হইল। আমিও অবিচ্ছেদ-সঙ্গিনী হইয়া হাওড়া ষ্টেশনের রিজার্ভ গাড়ীতে তাঁহার পার্শ্বে বসিলাম।

ভারতের বহু বিখ্যাত স্থানে তিনি আমায় লইয়া বেড়াইতে গিয়াছেন; অনেক দেখিয়াছি, অনেক শিখিয়াছি, ভোগের বিধান যত রকম কল্পনায় পাইয়াছিলাম—অনুষ্ঠানে ত্রুটী করি নাই। কিন্তু—সুখ কই? একটী দিনও ত তাহা পাই নাই! ধনবানের ঐশ্বর্য্যের মোহে পড়িয়া দাসীপনা করিতে কি ভাল লাগে? আমারও লাগে নাই।

প্রেমের পরিবর্ত্তে প্রবঞ্চনায় তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়া স্বার্থের ষোলআনা আদায় করিয়াও তৃপ্ত হই নাই। তাঁহার পিতার সঞ্চিত অর্থের অধিকাংশ আমি শোষণ করিয়া লইয়াছিলাম। কলিকাতার বাড়ী ও বাগান তিনি আমার নামে লিখিয়া দিয়াছিলেন।

প্রায় পাঁচবৎসর কিশোরীলালের সহিত একত্রে কাটাইয়াছি। এই পাঁচবৎসর কাল তিনি আমায় গলার হার করিয়া রাখিয়াছিলেন, কখন কখন চক্ষের জলে ভাসাইয়া একটী হাসির বিনিময় করিয়াছি, বিনা স্বার্থে কথাটী কহি নাই।

হঠাৎ ভয়ঙ্কর বসন্তের আক্রমণে কিশোরীলালের মৃত্যু ঘটে। শুনিয়াছিলাম—মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি আমায় একবার দেখিবার জন্য ছট্‌ফট্ করিয়াছিলেন, আকুল-নয়নে ঘরের এদিক ওদিক চাহিয়া আমায় কত খুঁজিয়াছিলেন,—সংক্রামক ব্যাধির ভয়ে আমি তখন দূরে সরিয়া ছিলাম, সাক্ষাৎ করিতে পারিলাম না। মৃত্যুর পর তাঁহার সুদূর জ্ঞাতিগণ অদূর আত্মীয়ের রূপ ধরিয়া আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইলেন, গতিক ভাল নয় বুঝিয়া আমিও তখন—যতদূর সম্ভব নগদ অর্থ আত্মসাৎ করিয়া—কলিকাতার বাড়ীতে আশ্রয় লইলাম।

*　　*　　*　　*

পুলিনের কথা।

(৫)

সুদীর্ঘ চারিবৎসর কাল প্রবাস বাসের পর গত বসন্তের শেষে যেদিন পি এণ্ড ও কোম্পানীর জাহাজে চড়িয়া প্লাইমাউথ্ বন্দর হইতে স্বদেশযাত্রা করিলাম, সেদিন আনন্দে আমার বুকটা খুব ভরিয়া উঠে নাই। প্রবাসী বাঙ্গালীর প্রাণ যে সকল কারণে স্বদেশযাত্রায় উৎফুল্ল হয়, আমার সেরূপ আকর্ষণ বিশেষ কিছু ছিল না। জাহাজ ছাড়িবার পূর্ব্বে বিলাতের লিলি, মেরী, ফ্যানি প্রভৃতি—আমাদের খেঁদী, পাঁচী, বুঁচি শ্রেণীর—রূপসী বালিকাগণের করুণ-বিলাপে ও বিদায়-অশ্রু-বর্ষণে আমার মনটা সত্যই দমিয়া গিয়াছিল। মনে হইতেছিল—অমর কবি মিল্টনের স্বর্গচ্যুত শয়তানের ন্যায় -আনন্দময় স্বপ্নরাজ্য ছাড়িয়া আমিও কোন্ দুঃখের অন্ধকার রসাতলে যাত্রা করিতেছি।

জাহাজ যতই অগ্রসর হইতেছিল, আমার দিনগুলি ততই বিষাদময়—ততই বিরক্তিকর হইয়া উঠিতে লাগিল। সমস্ত জাহাজটায় একটা মনের মত সঙ্গী খুঁজিয়া পাইলাম না! সকালে

ও সন্ধ্যায় অন্যান্য আরোহীরা ডেকের উপরে যাইত, আমার তাহা ভাল লাগিত না, একমাত্র ভোজনের টেবিল ব্যতীত নিজের কামরা ছাড়িয়া প্রায়শঃ আমি অন্য কোথাও বাহির হইতাম না। অসীম সিন্ধুর অনন্ত সৌন্দর্য্য দেখিতে দুই একবার ডেকের উপর গিয়াছিলাম, ভাল লাগে নাই, যে কয়খানা নভেল সঙ্গে আনিয়াছিলাম তাহা লইয়া কেবিন্ ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া থাকিতাম, আর শুধু ভাবিতাম—

কি জন্য—কোন্ সুখের আশায়—কলিকাতায় যাইতেছি? সেখানে আমার কি আছে? তিনকুলে আমার জন্য একফোঁটা চক্ষুর জল ফেলিবার কেহ নাই।

বাল্যকালে পিসীমার মুখে শুনিয়াছিলাম—গণ্ডযোগে আমার জন্ম, আমি ভূমিষ্ঠ হইবার পর একমাস মধ্যেই মাতাপিতার ভবযন্ত্রণা তিরোহিত হইয়াছিল। বাপ-মা-মরা ভাইপোদের প্রতি পিসীমাদের স্নেহ-ধারা সহজেই গলিয়া পড়ে শুনা যায়. আমার ভাগ্যে তাহার বিপরীত হইল। আমার পিসীমার অন্তরের কোন্ কোনে যে আমার জন্য একটু স্নেহেরকণা লুকান ছিল—আমি তাহা একদিনও দেখিতে পাই নাই, অবশ্য খুঁজিয়া দেখিবার চেষ্টাও করি নাই। নিতান্ত অনিচ্ছা স্বত্বে তিনি যেন আমায় পালন করিতেন। তাঁহার মুখে কখনও মিষ্ট কথা শুনিয়াছি—মনে পড়ে না; এমন কি, আহার করাইতে

বসাইয়াও—"বাপ খাইয়াছিস্, মা খাইয়াছিস্—এইবার আমায় শুদ্ধ গিলিয়া খা" --এইরূপ ভ্রুকুটি বচনে আমায় ধমকাইতেন। আমিও রাগ করিয়া মুখের গ্রাস পিসীর সর্ব্বাঙ্গে থু থু করিয়া ছড়াইয়া দিয়া পলাইয়া পরের বাগানে গিয়া ফলা'র করিতাম। কখনও বা সমবয়সী বালিকাদের সঙ্গে লুকাইয়া বৌ-বৌ খেলার নিমন্ত্রণ খাইতাম। সহপাঠীরা 'চ্যাং-দোলা' করিয়া যেদিন পাঠশালায় লইয়া যাইত, গুরুমহাশয়ের বহু বেত্রাঘাতেও আমার একফোঁটা চক্ষের জল বাহির হইত না।

এইরূপে পিসীমা আমায় চৌদ্দ বছরেরটী করিয়া তুলিয়া হঠাৎ একদিন চক্ষু বুজিয়া ভ্রাতার খোঁজে পরপারে পৌঁছিলেন, তাঁহার কঠোর শাসন হইতে অব্যাহতি পাইয়া আমিও হাফ্ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

দেশে তিষ্ঠিবার উপায় ছিল না; পিসীমার অবর্ত্তমানে অনেকেরই আমার উপর সু-নজর পড়িয়াছিল, ভিটাখানি ঘোষাল-খুড়াকে তাঁহার গোয়াল বাটী নির্ম্মাণ জন্য উৎসর্গ করিয়া আমি আজব সহর কলিকাতায় আগমন করিলাম।

বাবা ছিলেন কলিকাতার বড় উকীল ধরণীবাবুর মুহুরী, বলিতে ভুলিয়াছি—বাবার মৃত্যুর পর ধরণীবাবুর করুণার দান কিঞ্চিৎ মাসহরায় পিসীমা আমায় পালন করিতেন।

ধরণীবাবুর স্ত্রী আমায় আদর করিলেন; আমার গুণে নয়—

বিধাতার অনুগ্রহে। প্রথমতঃ—আমার সুরূপের সুখ্যাতি ছিল, বিলাতেও এই রূপের প্রভাবেই আমি সেখানকার বালিকা সমাজে পশার প্রতিপত্তি স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলাম। দ্বিতীয়তঃ—মন মজান' মিষ্ট কথায় মানুষ বশ করিতে আমার বেশী সময় লাগিত না। একমাত্র দুই তিন বৎসরের টুকটুকে রমা ভিন্ন তাঁহাদেরও আর সন্তান না থাকায় সহজেই আমি তাঁহাদের পুত্রের স্থান দখল করিতে পারিয়াছিলাম।

প্রথম প্রথম কলিকাতায় আসিয়া চারিদিক দেখিয়া খুব ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, পায়ে ব্যথা ধরিলেও মনের উৎসাহ কমিত না। দুই তিনবার রাস্তা ভুলিয়া হারাইয়াও গিয়াছিলাম, ধরণীবাবুর লোকেরা অতিকষ্টে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিল। তারপর ক্রমশঃ আমার স্বাধীনতা ঘুচিল। ধরণীবাবুর ভারি কড়া মেজাজ, আমার চাঞ্চল্য এবং উৎপাত সহিতে পারিতেন না। পুস্তকের চাপ ও মাষ্টারের তাড়নায় ফেলিয়া আমায় ধমকাইতে লাগিলেন। কিন্তু গৃহিণীর—আমি তাহাকে মা বলিতাম—অকৃত্রিম স্নেহাদরে ধরণীবাবুর সকল কঠোরতা আমার অনায়াসে হজম হইয়া যাইত। কখনও অবসর কিম্বা রমাকে নিরালায় পাইলে রমার গাল টিপিয়া—ফুল ছিঁড়িয়া—বই লুকাইয়া—ধরণীবাবুর প্রতি সমস্ত আক্রোশের সুদশুদ্ধ তাহার উপর দিয়া তুলিয়া লইয়া আপনার স্বাধীনতা জাহির

করিতাম। তথাপি ধরণীবাবুর কঠোর সতর্কতা আমার উপর লাগিয়া থাকিয়া ক্রমে আমায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরিখার ওপারে পৌছাইয়া দিল। তারপর আমি বিলাতে ব্যারিষ্টার হইতে গিয়াছিলাম।

সেই স্বাধীন দেশে পদার্পণ করিয়া নূতন আলোকে—নূতন পুলকে আমার নূতন চক্ষু ফুটিয়া দিনগুলি বেশ সুখে কাটিতেছিল। বাল্যস্বভাবের দুর্দ্দম চঞ্চলতা আবার জাগিয়া উঠিয়া নিত্য নূতন পথে অবাধ গতিতে ছুটীবার অবসর পাইয়াছিল, শাসন বা নিষেধ করিবার কেহ মাথার উপরে ছিল না, কোন দুর্ভাবনা ছিল না—ধরণীবাবু প্রতিমাসে স্বচ্ছল টাকা পাঠাইতেছিলেন। নিত্য নূতন নায়িকাগণের সংসর্গে মিশিয়া, নিত্য নূতন প্রণয়ের অনুশীলন ও অভিনয় করিয়া সেই দেশীয় নায়ক মহলে আমি একজন নামজাদা ভাগ্যবান হইয়া উঠিয়াছিলাম। ব্যারিষ্টারী সনন্দ পাইতে তিন বৎসরের অতিরিক্ত আরও এক বৎসরের প্রয়োজন হইল।

আমার বিলম্ব দেখিয়া ধরণীবাবু খুব কড়া কড়া চিঠি লিখিয়া অবিলম্বে আমাকে দেশে ফিরিবার জন্য তাগিদ করিতেছিলেন। আমি আজ কাল করিয়া দুই তিনবার অতিরিক্ত টাকা আনাইয়াও রওনা হইলাম না। অবশেষে তিনি ভয় দেখাইলেন—টাকা পাঠান বন্ধ করিবেন, সুতরাং তখন বাধ্য হইয়া স্বদেশ যাত্রা করিলাম।

জাহাজের কেবিনে এইরূপ একাকী বসিয়া একে একে জীবনের সকল কথাই চিন্তাপথে আসিল। হঠাৎ মনে পড়িল—রমার মুখখানি, অমনি আর একটা ভাবনা উদয় হইল—রমা কি আমার হইবে না? ধরণীবাবুই বা কেন—কোন্ স্বার্থের আশায় আমার এত উপকার করিলেন? শুধু কি স্নেহ-প্রবণতা—হৃদয়ের কোমলতাই ইহার মূল? অন্য কোন উদ্দেশ্য তাঁহার নাই? রমার সঙ্গে কি তিনি আমার বিবাহ দিবার কামনা করেন না? অবশ্যই করেন। নতুবা কেবল অনাথের উপকার করিতে হইলে সামান্য লেখাপড়া শিক্ষার পর একটা চাকুরীর সুবিধা অনায়াসে আমায় করিয়া দিতে পারিতেন, এত অর্থব্যয় করিয়া আমায় বি-এ পর্য্যন্ত পড়াইয়া আবার বিলাত পাঠাইবেন কেন? রমা এখনও অবিবাহিতা, গতবৎসর ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়াছে—সংবাদ পাইয়াছি।

রমা আমায় চিঠি লিখিত, অনেক লিখিত, সেগুলি বড় সাদাসিধা—আমি কেমন আছি, সে কেমন আছে, বাবা ও মায়ের খবর, পড়াশুনা ইত্যাদি—নিতান্ত ছেলেমানুষেরই মত সমস্ত। সে আমায় ভালবাসিত, তাহার সরল প্রাণ-টুকু আমার জন্য স্নেহ মমতায় ভরা থাকিত, একটুকাল আমার মুখে হাসি না দেখিলে শতপ্রশ্নে আমায় অধীর করিয়া তুলিত; আমি বরং সময়ে সময়ে বিরক্তি প্রকাশ

করিয়া তাহাকে বিদায় করিতাম। তবে তাহাকে বালিকা দেখিয়া আসিয়াছি, এই কয়বৎসরে কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে—স্ত্রীচরিত্র—কে জানে!

রমাকে পাওয়া আমার চাই-ই। ধরণীবাবু বৃদ্ধ হইয়াছেন, যেদিন চক্ষু মুদিবেন, তাঁহার অগাধ ঐশ্বর্য্য—সমস্ত আমার। তারপর রমা আমায় ভাল বাসুক না বাসুক—ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না, অর্থ থাকিলে রূপের অভাব কি? আনন্দ উড়িয়া আসিয়া গায়ে পড়ে।

যাহাহউক, এ সকল মীমাংসা কলিকাতায় না যাইয়া করিতে পারিতেছি না। সঙ্গে টাকাকড়িও বেশী নাই, ধরণীবাবু শেষবারে বেশী টাকা পাঠান নাই, মাত্র কলিকাতায় পৌঁছিতে আমার কষ্ট না হয়—এমন বিবেচনায় পাঠাইয়াছেন। যতই ভাবি—এ সকল ভাবনা ভাবিব না, ক্ষেত্র বুঝিয়া যেরূপ হয় কার্য্য করিব, ভাবনা ততই আমায় জড়াইয়া ধরে! এইপ্রকার নানাবিধ দুর্ভাবনার মধ্যদিয়া এডেন পর্য্যন্ত পৌঁছিতে ক্রমে আমার শরীর খারাপ হইয়া পড়িল। এডেন হইতে যেদিন জাহাজ ছাড়িল—পরদিন আমার প্রবল জ্বর হইয়া ক্রমে আমি উত্থান-শক্তি রহিত ও ক্ষণে ক্ষণে অচৈতন্য হইয়া পড়িতে লাগিলাম।

যেদিন বম্বে পৌঁছিলাম—আমার জ্ঞান থাকিলেও কোন

শক্তি বা সাধ্য রহিল না, গাল গলা কুঁচ্‌কি ফুলিয়া উঠিয়া প্লেগে আক্রান্ত হইয়াছি। জানিলাম—জাহাজের আরও অনেক আরোহী এই রোগে প্রাণ হারাইয়াছে।

বম্বেতে তখন ভীষণ প্লেগের প্রকোপ। নগরবাসী অনেকে মরিয়াছে, অনেকে মরিতেছে, অনেকে বা পলাইয়া প্রাণ বাঁচাই-তেছে; নগর উজাড়—শূন্য ঘরবাড়ী গুলি পড়িয়া রহিয়াছে।

জাহাজে সরকারী পরীক্ষা আরম্ভ হইল। রোগীদিগকে কোয়ারেন্‌টাইনের নিয়মে পড়িয়া হাঁসপাতালে যাইতে হইতেছে, নীরোগ ব্যক্তিরাও কুঁচ্‌কী টিপাইয়া পরীক্ষা না দিয়া রেহাই পাইতেছেন না। বলা বাহুল্য—আমিও কোয়ারেন্‌টাইনের কবলিত হইয়া হাঁসপাতালে প্রবেশ করিলাম।

হাঁসপাতালে বেজায় ভিড়। স্থানের অভাবে প্রাসাদ সম্মুখস্থ প্রান্তরে তাঁবু ফেলিয়া রোগীর শয্যা হইতেছে, তথাপি স্ত্রী পুরুষের বিভিন্নস্থান সম্ভব হইতেছে না, যাহাকে যেখানে পারিতেছে রাখিয়া দিতেছে। দ্বিতলের এক নাতিক্ষুদ্র কক্ষমধ্যে কয়েক ব্যক্তি আমায় লইয়া গেল, তখনও আমার সামান্য জ্ঞান ছিল, দেখিলাম—সেই কক্ষের পাঁচখানি শয্যার চারিখানি ইতিপূর্ব্বেই পূর্ণ হইয়াছে, অবশিষ্ট শূন্য শয্যায় তাহারা আমায় শয়ন করাইয়া দিল, তারপর আর আমার জ্ঞান ছিল না।

(৬)

নারীভাগ্যটা বোধহয় আমার গণ্ডযোগের সুফল,—হাঁস-পাতালেও তাহা মিলিল !

আমার শয্যার ঠিক বামপার্শ্বে এক রোগিণী ছিল,—সে যুবতী—যৌবন-তরঙ্গে প্রথম গা ভাসাইয়াছে ! শুধু যুবতী নয়—একরাশি কাল চুলের মধ্যে তাহার জ্বরে তপ্ত আরক্ত মুখখানি দেখিলে বুকে লইতে ইচ্ছা হয়। প্রথম প্রথম কয়দিন আমরা উভয়েই অত্যধিক পীড়িত থাকায় আলাপের বড় সুবিধা হয় নাই। মৃত্যুমুখ হইতে ফিরিয়া উভয়েই যেমন আরোগ্যের পথে উঠিতে ছিলাম, আমি আলাপের সুবিধা খুঁজিয়া লইলাম।

দু'জনেই দু'জনকে দেখিতেছি, কিন্তু দৃষ্টি মিলিত হয় না, আমি যখন অন্যদিকে চাহিয়া থাকি, তখন সে আমায় দেখে। একদিন তাহার ডানহাতের আংটী-টি হঠাৎ খাটের নীচে পড়িয়া গেল। তুলিয়া লইবার জন্য সে কষ্ট করিয়া উঠিতেছে, আমি অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি উঠিয়া আংটী-টি কুড়াইয়া তাহার হাতে তুলিয়া দিলাম। সে দুইটী চক্ষু তুলিয়া আমার দিকে চাহিয়া একটু হাসিল, আমিও প্রতিদানে তাহার দৃষ্টি নত করাইলাম।

তদবধি আমাদের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

নামটী তাহার—সোণা। মাতা পিতা কে—জানে না, শৈশব হইতে এক ধাত্রী তাহাকে পালন করিয়াছিল, সেই ধাত্রীর মৃত্যুর পর হইতে গোপীকিষণ নামে কোন এক সদাশয় পাঞ্জাবী ভদ্রলোক তাহার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়া পিতার মত তত্বাবধান করিয়া তাহাকে বালিকা-কলেজে পড়াইতেছিলেন, সোণা বেশ ইংরাজী বলিতে পারিত। ধোবীতলাও গলিতে গোপীকিষণের ভাড়াকরা ঘর ছিল, কিন্তু সোণা থাকিত কলেজ-হোষ্টেলে, বিদ্যালয় বন্ধ হইলে ধোবীতলাও গলির বাসায় আসিতে হইত।

গোপীকিষণ তখন কার্য্যব্যপদেশে রেঙ্গুন গিয়াছিলেন, ফিরিতে পারেন নাই—ইতিমধ্যে বম্বে প্লেগের প্রলয় আরম্ভ হয়। সোণাকেও ধোবীতলাও হইতে প্লেগে আক্রান্ত হইয়া হাঁসপাতালে আসিতে হইয়াছিল। তাহার রহস্যময় জীবনকাহিনী শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, ভাবিলাম—আমিও যেমন হতভাগ্য—সোণাও তেমনি হতভাগিনী!

তিন সপ্তাহ পরে আমি উঠিয়া হাঁটিবার বল পাইলাম। তখন আর হাঁসপাতাল ভাল লাগিল না। ডাক্তার আসিলে আমার সঙ্গীয় জিনিষাদির সন্ধান তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। অতি ভদ্রলোক তিনি, সমস্তই ফিরিয়া পাইবার বন্দোবস্ত স্বয়ং করিয়া দিবেন—কথা হইল। সোণা আমার অপেক্ষা

শীঘ্র সুস্থ হইতেছিল—দুই একদিন মধ্যেই আপনার বাসায় ফিরিয়া যাইবে—এইরূপ বলিতেছিল। সে আমায় জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কি কালই হাঁসপাতাল ছাড়িবার মনস্থ করিয়াছেন ?"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"হাঁ, শুনিলাম—কালই আমায় ছাড়িয়া দিবে।"

"এখানে থাকিবেন কোথায় ?"

"থাকিবার সুবিধা এখানে নাই—কিছুই চিনি না।"

"তবে ?"

"কলিকাতার গাড়ীতে উঠিব।"

"সে কি !"

"কেন ?"

"এত দুর্ব্বল শরীর লইয়া কলিকাতা যাত্রা উচিত নয়।"

"কি করিব—আর হাঁসপাতালে মন টেকেনা।"

সোণা একটু চুপ করিল, নীরবে নতমুখে ক্ষণেক ভাবিল, তারপর মুখখানি ঈষৎ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"একটী কথা বলিব—কিছু মনে করিবেন না—"

আমি বলিলাম—"বল।"

"যদি আপত্তি না থাকে, আমাদের ঘরে চলুন না ! কোন অসুবিধা হইবে না।"

আমার আপত্তি একতিলও নাই, বরং ভালই হয়; দিনকয়েক আরামে থাকিয়া দেহটাও সুস্থ হইবে, আর সোণার মত রূপবতী বালিকার সঙ্গে সরস কথা কহিয়া প্রাণটাও তাজা হইবে—সঙ্গে সঙ্গে সহরটা ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে পাইব। তথাপি মিনিট খানেক চিন্তার ভাণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"সেখানে আর যাহারা আছেন, তাঁহাদের আপত্তি হইবে না?"

সোণা বলিল—"আরত কেহ নাই, গোপীকিষণ রেঙ্গুন গিয়াছেন। দুইখানি ঘর আমাদের, আপনার কোনও কষ্ট হইবেনা। বাড়ীটায় আরও অনেক ভাড়াটীয়া আছে, এখন কে কোথায়—জানি না।"

আমি বলিলাম—"যদি গোপীকিষণ আসেন?"

"আর একটা খালিঘর আমরা দখল করিয়া লইব।"

"গোপীকিষণের আপত্তি হইবে না?"

সোণা মাথা নীচু করিয়া ছোট একটী "না" বলিল।

পরদিন সকালে সোণাই সমস্ত উদ্যোগ করিয়া আমাকে লইয়া হাঁসপাতাল বাহিরে ঠিকা গাড়ীতে উঠিল; গাড়ীতে উঠিয়া একটু পরিহাসচ্ছলে সোণাকে আমি বলিলাম—"কিন্তু আমি বাঙ্গালী, আমাকে ঘরে স্থান দিতে তোমার আপত্তি হইলনা কেন?"

সোণা হাসিয়া উত্তর করিল—"শুনিয়াছি—আমিও বাঙ্গালীর মেয়ে, আর তাহা না হইলেও আমার সেরূপ কুসংস্কার নাই।"

দিব্য ঝক্‌ঝকে প্রায় নূতন পাঁচতলা প্রকাণ্ড বাড়ীখানি, দ্বিতলের একপার্শ্বের দুইটী সুসজ্জিত ঘরের দরজা সোণা একে একে খুলিল, উহার একখানি গোপীকিষণের—অপরখানি সোণার নিজের; গোপীকিষণের ঘরে আমার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া সোণা তাহার আপনার ঘরে গেল। বাড়ীর অনেক ঘরই খালি পড়িয়া ছিল। স্থানটী আমার মনোমত হইল।

সোণার শরীরে অনেক গুণ, কেবল অসামান্য রূপের ডালি লইয়া সে সংসারে আসে নাই। গৃহকর্ম্মে তাহার বেশ নিপুণতা, তাহার হাতের সুন্দর সেলাই ও শিল্প কার্য্যের পরিচয় তাহাদের ঘরে অনেক দেখিয়াছি। ষ্টোভ্ জ্বালাইয়া লইয়া প্রত্যহ সোণা রাঁধিত —বেশ রাঁধিতে পারিত—আমি নিকটে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িয়া তাহাকে শুনাইতাম; তারপর একই সময়ে দুইজনে খাইতাম—বড় মিষ্ট লাগিত! প্রাণের সহিত সোণা আমার পরিচর্য্যা করিতে লাগিল—কোনও প্রকারে আমার কষ্ট বা অসুবিধা না হয়। মনটী তাহার উদার, নির্ম্মল, স্নেহ-মমতায় পরিপূর্ণ!

দিন দিন যতই ভাল হইতে লাগিলাম—দুইবেলা সমুদ্রের ধারে, পাহাড়ে এবং নগরের দেখিবার যোগ্য সমুদয় স্থান ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলাম। সোণাও তাহার দুর্লভ সৌন্দর্য্যরাশি লইয়া সর্ব্বদা ছায়ার মত আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত, আমায় যত্ন করিত,

সমস্ত দেখাইয়া—চিনাইয়া সর্ব্বপ্রকারে আমার মনস্তুষ্টির চেষ্টা করিত। আমি যে তাহার অতিথি—একথা সে ভুলিয়া গিয়াছিল, —আমি যেন তাহার কোন পরমাত্মীয়—আপনার লোক। বুঝিলাম—হতভাগিনী আমায় ভালবাসিয়াছে। নারীর প্রাণ লইয়া কত খেলা খেলিয়াছি,—সোণার ভাব বুঝিতে বিলম্ব হইল না—সত্যই সে আমায় ভালবাসিয়াছে—মজিয়াছে। বিদেশে কতরকম ভালবাসার অভিনয় দেখিয়াছি—করিয়াছি, সোণার মত ভালবাসিতে কিন্তু কাহাকেও কখন দেখি নাই!

দিন দিন সোণার অন্তরটা যতই বুঝিতে লাগিলাম, আমি ততই জিতেন্দ্রিয় তপস্বীর মত গম্ভীর ভাব অবলম্বন করিলাম; সোণার উপকারের জন্য নহে—মোহজালে তাহাকে আরও জড়াইয়া ফেলিবার ছলনায়। ইচ্ছা হইত—যখন তখন সোণাকে বুকে টানিয়া লই, অমনি কুটীলতায় আত্মসংযম করিয়া মনোভাব চাপিয়া রাখিতাম।

একদিন সোণাকে লইয়া নৌকায় উঠিয়া সমুদ্রভ্রমণে গিয়াছিলাম। তীর হইতে সামান্য দূরে নৌকা থাকায় সেইদিন মাত্র সোণাকে দুই হাতে বুকে তুলিয়া নৌকায় উঠাইয়া দিয়াছিলাম। লজ্জায় তাহার সুন্দর মুখখানি রক্তিম হইয়া সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিয়াছিল!

* * * * * *

(৭)

একদিন বৈকালে পোষ্ট অফিস হইতে ধরণীবাবুর প্রেরিত টাকা লইয়া বাহির হইলাম। টাকাটা হাতে পড়ায় মনে একটু স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল, ক্ষুধাও বোধ করিয়াছিলাম, এক হোটেলে ঢুকিয়া কিছু পানাহারে শরীর তাজা করিয়া সমুদ্রের ধারে বেশ এক চক্কর দিয়া সোণার জন্য মার্কেট হইতে একরাশি ফুল কিনিয়া বাসার দিকে ফিরিলাম। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া নগর আলোক-মালায় উজ্জ্বল শোভাময়ী হইয়া উঠিয়াছিল।

বাসায় ফিরিয়া দ্বিতলের বারান্দায় উঠিতেই রমণী কণ্ঠের কোমল ও সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি শুনিতে পাইলাম। শুধু গান নয়—সঙ্গে সেতারের সুমিষ্ট ঝঙ্কারও কাঁপিয়া কাঁদিয়া নাচিয়া নাচিয়া কণ্ঠস্বরের সহিত মিলিয়া মিশিয়া খেলা করিতেছিল! বুঝিলাম—সোণা গান করিতেছে। সে যে এমন সুন্দর গাহিতে পারিত—আমার ধারণা ছিল না। দরজার দূরে নীরবে দাঁড়াইয়া কিছুকাল শুনিয়া ক্ষণিকের জন্য মুগ্ধ হইলাম। সেইদিন বুঝিয়াছিলাম—সঙ্গীতেরও রূপ আছে—প্রাণ আছে—মোহময় উত্তেজনা আছে! কল্পনার নেত্রে দেখিতেছিলাম—সঙ্গীত যেন সোণার

রূপ ধরিয়া প্রাণ খুলিয়া প্রেমের অঞ্জলি আপনার প্রাণময়ের উদ্দেশ্যে ছন্দে ছন্দে ঢালিয়া দিতেছে! সঙ্গীতের এমন সম্মোহন রূপ—জীবনে আমি সেই একবারমাত্রই দেখিয়াছিলাম!

কিন্তু এত ভাল আমার সহ্য হইল না—চঞ্চল মন তখনই আমায় টানিয়া বাস্তব-জগতে ফিরাইয়া আনিল, ধীরে ধীরে গৃহপ্রবেশ করিলাম।

আমাকে দেখিয়া সোণা লজ্জিতা হইয়া হাসিয়া তাড়াতাড়ি অন্য ঘরে দৌড়াইয়া পলাইল। আমি তাহাকে ডাকিলাম, সে আসিল না। আবার ডাকিলাম, সে জানাইল—"আসিতেছি", কিন্তু আসিল না; লজ্জায় আসিতে পারিল না। তারপর আমিও হাসিতে হাসিতে বলিলাম—"সোণা! এস. দেখ—তোমার জন্য কি আনিয়াছি।"

এইবার সে লজ্জা এড়াইবার জন্য চঞ্চল-চরণে আমার সম্মুখে আসিয়া হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল—"কৈ, দেখি—কি?"

আমি ফুলের রাশি তাহার সম্মুখে ধরিলাম, সোণা খুব খুসী হইয়া ফুলগুলি বুকে তুলিয়া লইয়া বলিল—"বাঃ—সুন্দর ফুলগুলি! কোথায় পাইলেন?"

আমি তখন বলিলাম—"মূর্ত্তিমতী সঙ্গীত-রূপে এইমাত্র যাহাকে তুমি তোমার সর্ব্বস্ব দান করিতেছিলে, প্রতিদানে এই ফুলের উপহার আমার হাত দিয়া সে তোমায় পাঠাইয়াছে।"

"যান্—আপনি ভারি দুষ্ট"—বলিয়া ফুলগুলি লইয়া সে তাহার নিজের ঘরে পলাইল। আমি তাহার উদ্দেশে চাহিয়া থাকিয়া ভাবিতে লাগিলাম—কি স্বভাব এই স্ত্রী জাতির! জানি—আমায় ভালবাসে, তবু বুকের কথা মুখে ব্যক্ত করিয়া ধরা দিতে চাহে না। যদি তাহা পারিত, সংসারে সুখের পথ কত সুগম হইত!

কিছুক্ষণ পরে কতগুলি ফুলভরা ফুলদানি লইয়া সোণা এ ঘরে ফিরিয়া আসিয়া মনোমত স্থানে তাহা সাজাইয়া রাখিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করিল—"দেখুন দেখি—কেমন মানাইয়াছে!"

"একটু খুঁত আছে"—এই বলিয়া আমি ফুলদানী হইতে একটী আধফোটা গোলাপ তুলিয়া ক্ষিপ্রহস্তে সোণার কৃষ্ণ-কবরী মধ্যে গুঁজিয়া দিলাম। আমার বেশ মনে আছে—সোণা তখন একটীও কথা কহিতে পারে নাই, হাসিমাখা মুখখানি তাহার লজ্জায় লাল হইয়া উঠিয়াছিল। আমি তখন স্থির করিতে পারি নাই—কে বেশী সুন্দরী, সেই অর্দ্ধস্ফুট গোলাপ —না—ফুটন্ত যৌবনা সোণা!

"বাবুজি—তার হ্যায়"—বলিয়া ঠিক এই সময়ে টেলিগ্রাফ পিয়ন দরজা হইতে হাঁকিল। আমি অতিমাত্রায় বিরক্ত হইয়া ফিরিয়া বলিলাম—"তোমার মুণ্ডু হ্যায়—লেয়াও।"

"গোস্তাকি মাপ কিজিয়ে—"বলিয়া পিয়ন টেলিগ্রাফ দিয়া

স্বাক্ষর লইয়া দ্রুত প্রস্থান করিল। বোধহয়—পিয়নটারও রসবোধ ছিল !

সোণার নামের টেলিগ্রাফ দেখিয়া তাহার হাতে দিলাম, সে পাঠ করিয়া চিন্তান্বিতা হইয়া বসিয়া পড়িল। আমি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"ব্যাপার কি ?"

সোণা বলিল—"না, কিছু নয়, গোপীকিষণ আসিতেছেন।"

তাহার ঐ 'কিছু নয়' কথাটা যে খুব 'বেশী কিছু'—তাহা বুঝিতে আমার বিলম্ব হইল না। জিজ্ঞাসা করিলাম—"কবে আসিবেন ?"

"আজ এতক্ষণে কলিকাতা হইতে রওনা হইতেছেন" বলিয়া টেলিগ্রাফটী সোণা আমার হাতে দিল। আমি পড়িয়া বলিলাম—"তা বেশ ত, ভালই হইল, বহুদিন পরে আপনার লোককে গৃহে পাইয়া সুখী হইবে।"

সোণা সে কথার উত্তর করিল না, বসিয়া ভাবিতেছিল, হঠাৎ তাহার মুখখানি—চাঁদের উপর কুয়াশার মত—বিষাদের ছায়ায় মলিন হইয়া গিয়াছিল, কি যেন একটা আশঙ্কা ও দুশ্চিন্তায় সে অভিভূতা হইয়া পড়িয়াছিল ; আমি তাহা লক্ষ্য করিলাম, বলিলাম—"তবে আর কি, আমি ত এখন সুস্থ হইয়াছি, এইবার বিদায় হই ?"

সোণা কোন কথা বলে না—চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতেছে ;

আমি আবার বলিতে লাগিলাম—"আর আমার বিলম্ব করা সঙ্গত হয় না, কলিকাতায় সকলে আমার জন্য উদ্বিগ্ন রহিয়াছে।"

সোণা এইবার ধীরে ধীরে বলিল—"কবে যাবেন?"

আমি বলিলাম—"কালই।"

"গোপীকিষণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন না?"

"পারিলে ভাল হইত, এতদিন তাঁহার গৃহে আনন্দে কাটাইয়া গেলাম, সাক্ষাৎ হইলে কৃতজ্ঞতা জানাইতাম।"

"তবে?"

"কিন্তু, তাহা কি সঙ্গত হইবে—তোমার কি অভিপ্রায়?"

সোণা আবার চুপ করিল, আমি আবার বলিলাম—"আমাকে এখানে দেখিলে গোপীকিষণ কি সন্তুষ্ট হইবেন?"

সোণা বলিল—"বোধ হয়—না।"

"তবে আমায় বিদায় দাও?"

সোণার মুখখানি কাঁদ কাঁদ হইয়া উঠিল, বলিল—"আবার কবে এদিকে আসিবেন?"

"স্থির কি আছে? একেবারে আসিব কিনা, তাহাই বা কে জানে!"

"আর আসিবেন না!"—বলিয়া মুখ তুলিয়া অতি করুণ দৃষ্টিতে সে আমার দিকে চাহিল। আমি বলিলাম—"আসিবার ত কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না।"

সোণা এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া আবার মাথা নত করিল। দুইজনেই কিছুকাল নীরব থাকিলাম, পরে আমি বলিলাম—"সোণা! একটা কথা আমায় খুলিয়া বলিবে?"

"বলুন।"

"গোপীকিষণ তোমার কে হন?"

"পূর্ব্বেই বলিয়াছি—আমার প্রতিপালক।"

"আর কিছু—?"

"না।"

"তুমি তাঁহাকে ভাল বাসিতে না?"

"এতদিন ভক্তি করিতাম, এবার বুঝি তাহাও পারিব না!"

আমি কৌতূহলে প্রশ্ন করিলাম—"কি রকম?"

"তাঁহার পূর্ব্ব স্বভাব আর নাই, এখন তিনি চাহেন—"

সোণা আর বলিতে পারিল না, লজ্জায় কণ্ঠরুদ্ধ হইল। আমি বুঝিলাম, বলিলাম—"বিবাহ করিতে?"

"তা-ও নয়, সে পশু।"

ঘরে গোপীকিষণের আলোক চিত্র ছিল, চাহিয়া দেখিলাম—চেহারা ভাল নয়, বয়স পঞ্চাশের উপর হইবে। আমি অবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিলাম—পুরুষের চরিত্রও কম আশ্চর্য্য নহে, মরণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মানব-প্রকৃতিকে বিশ্বাস নাই; যে সোণাকে

কন্যার মত গোপীকিষণ লালিত ও বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছেন, এক্ষণে নিজের বৃদ্ধকালে তাহারই উপর লালসা!

আমি বলিলাম—"কিন্তু আমার এখানে আগমন এবং অবস্থানের সংবাদ কি গোপীকিষণের কর্ণগোচর হইবে না?"

সোণা বলিল—"অবশ্যই কেহ বলিবে, আমিও হয়ত না বলিয়া পারিব না।"

"তিনি বিরক্ত হইবেন না?"

"হইবেন।"

"তুমি তাঁহাকে ভয় কর?"

"করি, সে ভয়ঙ্কর লোক। তা—হৌক, যাহা হইবার—আমার উপর দিয়া হইয়া যাইবে, আমি সে জন্য প্রস্তুত।"

"তবে জানিয়া শুনিয়া কেন তুমি আমায় গৃহে আনিয়া আপনার বিপদ আপনি ডাকিয়া আনিলে?"

সোণা একটু হাসিল, কিন্তু সে শুষ্ক হাসি!

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"চেষ্টা করিয়া গোপীকিষণকে কি তুমি ভালবাসিতে পার না?"

সোণা ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"ছিঃ—সে পিতার সমান।"

আমিও হাসিলাম, প্রশ্ন করিলাম—"তবে কাহাকে তুমি ভালবাস?"

সোণা আবার কথা কহে না; আমি বলিলাম—"বল না—সে সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিটী কে? আমি এখনি তাহার সন্ধান করিয়া তোমার সম্মুখে আনিয়া দিতেছি।"

"যান্!"—বলিয়া সোণা তাড়াতাড়ি উঠিয়া আমার দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন সকালে উঠিয়াই জিনিষপত্র গুছাইয়া সেদিনের বৈকালের মেল গাড়ীতে কলিকাতায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। কিন্তু মন ভাল নয়, সোণাকে ছাড়িয়া যাইতে মাত্রই ইচ্ছা নাই, কি করিব—গোপীকিষণ আসিতেছে, এখন না যাইয়া উপায় নাই। সোণার ভাবও ঠিক অন্যরকম হইয়া গিয়াছে, মুখের সেই নিয়ত হাসি, সে প্রফুল্লতা আর নাই, সমস্তই যেন শুকাইয়া এক রাত্রি মধ্যে চেহারার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। চক্ষু রুক্ষ ও রক্তবর্ণ, বোধ হয় রাত্রে ঘুম হয় নাই, মুখভাব গম্ভীর—কেবল কলের পুতুলের মত নীরবে আপনার কাজগুলি করিয়া যাইতেছে।

বৈকালে যাত্রার সময় উপস্থিত হইলে আমি প্রস্তুত হইয়া বিদায় লইবার জন্য সোণাকে ডাকিলাম, সোণা কোন উত্তর দিলনা, আমার সম্মুখে আসিলও না। তিন চারিবার ডাকিয়াও কোন সাড়া না পাইয়া আমি তাহার কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

দেখিলাম—সে বিছানায় পড়িয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতেছে।

আমি বলিলাম—"ও কি সোণা! তুমি কাঁদিতেছ—কি হইয়াছে?"

অবোধ শিশুর মত কাঁদিয়া উঠিয়া সোণা বলিল—"ও গো না—যেও না তুমি।"

আমি বলিলাম—"সে কি সোণা, আমি যে প্রস্তুত হইয়া বিদায় লইতে আসিয়াছি।"

সোণা শয্যা হইতে নামিয়া আমার পায়ের কাছে বসিয়া বলিল—"না, যেওনা, আমায় একা ফেলিয়া—যেওনা।"

আমি পুলকিত হইয়া বলিলাম—"বেশ, তবে তুমিও আমার সঙ্গে চল; কিন্তু আমায় কি তুমি ভালবাস সোণা?"

সোণা কাতর দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল,—"আমি জানিনা।"

তাহার মনের অবস্থা তখন কিরূপ—আমি বেশ বুঝিতে-ছিলাম, তৎক্ষণাৎ তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া বলিলাম—"দুষ্ট আমি নই—সোণা—দুষ্ট তুমি।"

সোণা আমার বুকে মুখ লুকাইয়া একটী তপ্ত দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে যেন তাহার এত দিনের বুকভরা বেদনাগুলি সমুদয় দূরীভূত করিয়া কত আরাম—কত শান্তি অনুভব করিল। কিছুক্ষণ

এইভাবে কাটিল। ক্রমশঃ সোণা প্রকৃতিস্থ হইয়া আমার বাহু-বেষ্টন হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া নিকটস্থ চেয়ারে বসিয়া পড়িল, আমিও তাহার পার্শ্বস্থ চেয়ারে বসিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিলাম—"তাহা হইলে তোমার যাওয়া স্থির,—সোণা ?"

আমায় বিস্মিত করিয়া সোণা গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করিল—"কোথায়—কাহার সঙ্গে ?"

আমি বলিলাম—"কেন, কলিকাতায়—আমার সঙ্গে।" সোণা চকিতে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া—"না-না, আমি যাব না," বলিয়া একেবারে জানালার কাছে গিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। আমি আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিলাম—এ আবার কি কথা! সোণার কি মাথা খারাপ হইয়াছে ? জিজ্ঞাসা করিলাম—"কেন, যাবে না কেন সোণা ?"

সোণা সেইরূপ মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"আমি আপনার কে ?"

আমি বলিলাম—"তুমি আমার জীবন—আমার সর্ব্বস্ব"।

"কিসে ?"

"নও কিসে ?"

সোণা আমার দিকে মুখ ফিরাইল, বলিল—"লোকের নিকট আমার কিরূপ পরিচয় দিবেন ?"

"তুমি আমার বিবাহিতা স্ত্রী।"

"তাহা ত হয় নাই!

"না হয় কলিকাতায় গিয়া হইবে।"

সোণা সন্তুষ্ট হইয়া আবার আমার নিকটে আসিল। আমি তাহার হাত দু'খানি আপনার হাতের মধ্যে চাপিয়া লইয়া বলিলাম—"সোণা! তোমায় কত ভালবাসি কিরূপে জানাইব বল? তোমায় আর্য্যসমাজ মতে বিবাহ করিব, তোমাকে চির-সঙ্গিনী করিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইব। বল—কি করিলে একথা তোমার প্রত্যয় হইবে?"

সোণা বলিল—"তোমার মুখের কথাই যথেষ্ট।"

আমি আবার তাহাকে কাছে টানিয়া লইলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম—"আমার সঙ্গে যাইতে আর কোন আপত্তি নাই?"

সোণা বলিল—"না।"

"তবে চল,—আজই—এখনি—"

"একটু কাজ বাকী আছে।"

"কি?"

"ব্যাঙ্কে আমার কিছু টাকা আছে, তাহা তুলিয়া লইয়া রওনা হইব।"

"টাকা! কত টাকা?"

"পাঁচ হাজার।"

আনন্দে আমি যেন আত্মহারা হইলাম। কিন্তু বাহ্যিক

সে আনন্দটা চাপিয়া রাখিয়া বলিলাম—"বেশ, তবে কালই যাওয়া স্থির।"

পরদিন কলিকাতার ডাকগাড়ি বম্বে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই কোনও এক ট্রেণের একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা রিজার্ভ করিয়া—'কামিনী ও কাঞ্চন' সমভিব্যাহারে—আমি কলিকাতা অভিমুখে নির্ব্বিঘ্নে যাত্রা করিলাম।

*　　*　　*　　*　　*

(পরেশের কথা।)

[৮]

তদবধি বিশ বৎসরের উর্দ্ধকাল হিরণকে দেখি নাই, কিম্বা তাহার কোন সংবাদ রাখি নাই। পরিবর্ত্তনশীল জগতে এই বিশ বৎসরের মধ্য দিয়া আমার উপর কত বিপর্য্যয় ঘটিয়া গিয়াছে! সেই স্নেহময় দাদামহাশয় আর নাই, মাতাপিতাকে হারাইয়াছি, উপার্জ্জনক্ষম হইয়া বিবাহ করিয়াছি, স্ত্রী কন্যা লইয়া কলিকাতায় সংসার পাতিয়া বসিয়াছি। রসিক ও হিরণের কথা আর মনে নাই।

কুক্ষণে সেদিন রবিবারে রেলযোগে কোন স্থানে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। আমার একটি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় তথায় অবস্থান করেন। অনেকদিন হইতেই সেখানে একবার যাইবার জন্য অনুরোধ-পত্র আসিতেছিল, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে আমার আর সময় হইয়া উঠে নাই। এইদিন আমার স্ত্রী ইন্দুমতীও আমার সঙ্গিনী হইবেন কথা ছিল, কিন্তু আমাদের একমাত্র বালিকা— তিন বছরের মীনার শরীর একটু অসুস্থ থাকায় তাহাকে ধাত্রীর উপর নির্ভর

করিয়া রাখিয়া যাইতে তাঁহার সাহস হইল না। সুতরাং আমি একাকী রওনা হইলাম।

সেখানকার আলাপ আপ্যায়ন ও গুরুতর ভোজন সমাপন করিয়া কলিকাতায় ফিরিবার জন্য ষ্টেশনে আসিতে সন্ধ্যা হইল। দেখিলাম ট্রেন আসিতেছে। এই ট্রেন অন্য কোন ষ্টেশনে না থামিয়া অতিক্রুত কলিকাতায় পৌঁছিবে। তাড়াতাড়ি একখানি প্রথম শ্রেণীর টিকিট লইয়া গাড়ীতে উঠিলাম এবং আমার অধিকৃত কক্ষে আর কোন যাত্রী না দেখিয়া অগত্যা খবরের কাগজ পাঠে মনঃ সংযোগ করিতেছি, এমন সময়ে—তখন গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িয়াছিল—ষ্টেশনের টিকেট-কালেক্টর তাড়াতাড়ি আসিয়া আমার গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিল এবং তৎপশ্চাৎ মূল্যবান বসন ভূষণে সজ্জিতা কোনও এক মহিলা প্রায় দৌড়াইয়া আসিয়া গাড়ীতে আরোহণ করিলেন; মহিলাটী একটী টাকা ফেলিয়া দিলেন, টিকিট-বাবুটী তাহা গ্রহণ করিয়া কৃতার্থের হাসিতে হাত উঠাইয়া লম্বা সেলাম ঠুকিলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। আমি কক্ষের অপর দিকে সরিয়া গেলাম, আগন্তুক রমণী দরজার নিকটেই রহিলেন।

পকেট হইতে একটী সিগার বাহির করিয়া মুখ ফিরাইয়া ধরাইতেছি, অমনি স্ত্রীলোকটী কে—দেখিবার কৌতূহলে

একবার গোপন দৃষ্টিতে তৎপ্রতি চাহিলাম। তিনি তখন পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া একটা শিশি মুখে লইয়া ঢক্ ঢক্ করিয়া কি ঢালিয়া খাইতেছিলেন, গন্ধে বুঝিলাম—মদ্য। আমি বিস্মিত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম, তিনিও মুখ ফিরাইলেন, গাড়ীর বিদ্যুৎ আলোকে দেখিলাম—সে হিরণ!

প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না, তাহার মত গ্রাম্য বালিকার এ কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন!

হিরণও বহুদিন পরে হঠাৎ আমাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল এবং ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া কিছুকাল স্থির দৃষ্টিতে আমাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল—"পরেশ বাবু!"

আমি বলিলাম—"আশ্চর্য্য! আমায় চিনিতে পারিয়াছ?"

হিরণ বলিল—"প্রাণ থাকিতে তোমায় ভুলিব?"

আমি বলিলাম—"কিন্তু দেখিতেছি—মরণ তোমায় ভুলিয়াছে!"

পূর্ব্বের মত আবার সেই খিল্ খিল্ স্বরে হিরণ হাসিয়া উঠিল। আশ্চর্য্য—এই দীর্ঘকালেও হিরণের চেহারার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন দেখিলাম না,—কি সুন্দর তাহার রূপ! কিন্তু সে রূপের প্রভা শান্ত বা স্নিগ্ধ নহে, বড় তীব্র—যেন উত্তাপময়; মদের নেশায় ঢুলু ঢুলু চক্ষু দুইটী বড় ভাবময়,

কিন্তু ে চক্ষের দিকে চাহিতে ভয় হয়। ঈষৎ জড়িত স্বরে সে বলিতে লাগিল—"মরণ কি কাহারও হাতধরা?"

আবার সেই উচ্চ হাস্য!

আমি কোন উত্তর করিলাম না, বুঝিলাম—তাহার অধঃপতনের আর কিছুই বাকী নাই। সে আবার বলিতে লাগিল—"কিন্তু আপনার সে হিরণ সত্যই মরিয়াছে—পরেশ বাবু! ইয়ে বাঁদীকা নাম—শ্রীমতী হীরা বাঈ।"

"হীরা বাঈ!"—আমি বলিয়া উঠিলাম—"কোন্ হীরাবাঈ?—বাঈজী হীরা?"

সে ব্যঙ্গস্বরে বলিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি যে নিরাশ্রয়াকে পায়ে ঠেলিয়াছিলেন, আজ সমস্ত ভারতের কত রাজা মহারাজা তাহারই একটী কৃপা-কটাক্ষের জন্য লালায়িত।"

আমি ভাবিলাম—উঃ—কি পরিবর্ত্তন! স্ত্রীলোকে সকলই সম্ভব! বলিলাম—"তোমার মরণই মঙ্গল ছিল।"

হিরণ উত্তর করিল—"কেন, মরিব কেন? আজ আর আমি দু'মুষ্ঠি ভাতের কাঙ্গালিনী নই, দু'পাঁচ লাখ্ দিতে পারি—নেবেন?"

রূপের পণ্যে সত্যই হিরণ ঐশ্বর্য্যশালিনী হইয়াছে, তাহার চেহারায় তাহা বুঝা যায়। কিন্তু মদের নেশায় সে আর দাঁড়াইতে পারিতেছিলনা, পা টলিতেছিল, অগত্যা বসিয়া

পড়িল এবং আবার ফ্লাস্ক মুখে লইয়া খানিক মদ গিলিল, পরে হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিল—“এখনও রাগ পড়ে নাই? কি অপরাধ আমার? একটি চুম্বন বৈত নয়! মাফ্ করিও, সামলাইতে পারি নাই, তোমার সেই ঈষৎ গোঁফের রেখায় সুন্দর ঘুমন্ত মুখখানি বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মে আরও সুন্দর হইয়া আমায় পাগল করিয়াছিল! সেজন্য শাস্তি দাও—শত চুম্বনে তুমি তাহার দণ্ড বিধান কর।”

হাসিতে হাসিতে সত্যই হিরণ আমার কাছে আসিতে লাগিল, আমি বিপদ গণিয়া শিহরিয়া উঠিলাম, ক্রুদ্ধস্বরে বলিলাম—“মাত্‌লামী করিও না।”

সে দাঁড়াইল বটে, কিন্তু মদের ফ্লাস্ক্ আমায় দেখাইয়া—“একটু খাবে—দোষ কি?” বলিয়া একেবারে আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া, হীরকাঙ্গুরীয় শোভিত সুন্দর করাঙ্গুলে ফ্লাস্ক্ আমার মুখের কাছে ধরিয়া আবার বলিতে লাগিল—“একটু খাও, আমার হাতের সাজা তামাক মিষ্ট লাগিত, খাইয়া দেখ—এ মর্ত্তের অমৃত।”

আমি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া হঠাৎ ফ্লাস্কটী তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া জানালা দিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিলাম।

অতিব্যস্তে হিরণ বলিল—“করিলে কি, আঃ—”

[illegible] বিষণ্ণ হইয়া আমাকে এক ভ্রুকুটি করিল, আমি দূরে সরিয়া হাসিতে লাগিলাম।

পাপিনীর স্পর্দ্ধা ইহাতে আরও বাড়িল—"তুমি বড় বেরসিক! কিন্তু—কিন্তু পরেশবাবু! আমার সাধ মিটে নাই, পিপাসার নিবৃত্তি হয় নাই, একটী—একটী মাত্র চুম্বনে—একবার তোমার ঐ অধর-সুধায় আমায় কৃতার্থ কর—একবার আমায় বুকে স্থান দাও"—বলিয়া বাহু বিস্তার করিয়া আমায় আলিঙ্গনাবদ্ধ করিতে আসিল, আমি পাশ কাটাইয়া অন্যদিকে পলায়ন করিলাম, সে টলিয়া বসিয়া পড়িল। পরে অভিমানিনীর মত আবার গ্রীবা তুলিয়া বলিতে লাগিল—"উপেক্ষা করিলে? ছিঃ—তুমি কেমন পুরুষ!"

আমার বড় হাসি পাইল, বলিলাম—"তোমার কাছে কাপুরুষ।"

"কেন?"—বলিয়া হিরণ ধীরে ধীরে জানালা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আমার প্রতি এক তীক্ষ্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল—"কেন, কিসের অভাবে—রূপের? এদেহে কি তাহা নাই? প্রাণটাকে সজীব করিয়া একবার হাসিমুখে আমার পানে চাও দেখি; দেখ দেখি—আমার এই চক্ষে, এই বক্ষে, এই অধরে অফুরন্ত মধু মাধুরী লুক্কাইত আছে কিনা? এই ঢল ঢল যৌবন তরঙ্গে গা ঢালিতে সাধ হয় কিনা? আমার প্রেমে কৃতার্থ হইতে পুরুষের প্রাণ চঞ্চল হয় কিনা?"

সত্যই হিরণকে বড় সুন্দর দেখাইতেছিল !—মাথায় কাপড় নাই, কৃষ্ণ কবরী খুলিয়া কুন্তলরাশি পৃষ্ঠে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, মদিরা প্রভাবে অধরে, গণ্ডে রক্তপ্রভা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। নানারূপ নয়ন ভঙ্গে, গর্ব্বে ও হাস্যে মৃণালবাহু দোলাইয়া আমায় প্রলুব্ধ করিবার জন্য সে বলিতে লাগিল—"কিসের জন্য জীবন? ইচ্ছা করিয়া কেন দুঃখকে টানিয়া আনিতেছ? আমি জানি—মানুষের জীবন একটা অফুরন্ত হাসির লহর, অসংখ্য সুখের প্রস্রবণ চারিদিকে ছুটিয়া চলিয়াছে, এস—এই অনন্ত আনন্দ স্রোতে আমার সঙ্গে গা ভাসাও।"

রূপ-কথার রূপসী রাক্ষসীর গল্প আমার মনে পড়িল, শরীর রোমাঞ্চ হইল, আর তাহার দিকে না চাহিয়া মুখ ফিরাইলাম।

উন্মত্তা মৃদুহাস্যে ও জড়িত স্বরে আবার বলিতে লাগিল—"ও—পরীক্ষা—পরীক্ষা করিতেছ !—সত্যই তোমায় আমি ভাল বাসি কিনা, তা—ই? তাই বল, নতুবা এ অধরের একটী চুম্বন এমন কোন্ প্রেমিক পুরুষ উপেক্ষা করিতে পারে—জানিনা। পরীক্ষা করিবে? বল—কি পরীক্ষা দিব—কি পরীক্ষা চাও?"

হিরণের কথায় বড় বিরক্ত হইলাম, কোন উত্তর করিলাম না, তেমনি মুখ ফিরাইয়া রহিলাম।

হিরণের মুখ বন্ধ নাই—"তোমার জন্য আমি প্রাণ দিতে

পারি, দেখিবে—সত্য কি না ?”—বলিয়া সত্যই সে চলন্ত গাড়ীর দরজা খুলিয়া ফেলিল, হাসিতে হাসিতে রহস্যের ছলে বলিতে লাগিল—“তুমিত আমার মরণ চাও, পড়ি—দিই লাফ্ ?”

এইবার আমার ভয় হইল, মাতাল সে, সত্যই যদি টলিয়া গাড়ী হইতে পড়িয়া যায়! তাহাকে ভুলাইবার জন্য মিষ্ট-স্বরে বলিলাম—“কেন, মরিবে কেন—প্রাণটা কি এতই সস্তা ?”

হিরণ উত্তর করিল—“উপেক্ষিতার প্রাণের আবার মূল্য কি ? আমার মরণই ভাল।”

আমি ব্যস্ত হইয়া বলিলাম—“না-না, বন্ধ কর—বন্ধ কর—দরজা, শীঘ্র বন্ধ কর!”

হিরণ বলিতে লাগিল—“তবে একবার আমার বাসনা পূর্ণকর, একটী চুম্বনে আমায় তৃপ্ত কর। লোকলজ্জা ? তা—ভয় কি ? এই নির্জ্জন কক্ষে কেহ আমাদের দেখিবে না, কেহ জানিবে না, তোমার কোন ক্ষতি হইবে না—তোমার অধরে একটী দাগও পড়িবেনা, অথচ—আমার বহুদিনের অতৃপ্ত পিপাসার শান্তি হইবে।”

আমি গম্ভীর স্বরে বলিলাম—“অসম্ভব।”

হিরণ হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিল—“তোমার বিশ্বাস হইতেছে না—কেমন ? ভাবিতেছ—এই চলন্ত গাড়ি হইতে

কেহ লাফাইয়া পড়িতে পারে না—না? আচ্ছা, দিই—দিই লাফ্ -পড়ি?—নতুবা একবার আমার……"

আর বলিতে পারিল না, কথা আর শেষ হইল না। চলন্ত গাড়ী তখন হঠাৎ একবার কাত্ হইয়া খুব জোরে দুলিয়া উঠিল, উন্মাদনায় বিকৃত মস্তিস্ক হিরণও টাল সাম্লাইতে না পারিয়া গাড়ী মধ্য হইতে ছিট্‌কাইয়া বাহিরে রাত্রির ক্রোড়ে পড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে উন্মুক্ত দরজা সবেগে বন্ধ হইয়া গেল। আমি তৎক্ষণাৎ হিরণকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলাম—পারিলাম না, দরজার কাচখানি যে তোলা ছিল সেদিকে আমার লক্ষ্য ছিল না, মস্তকের গুরুতর ধাক্কায় কাচখানি ঝন্ ঝন্ শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল, আমিও বাধা ও আঘাত পাইয়া মূর্চ্ছিতের মত গাড়ীমধ্যে পড়িয়া গেলাম।

গাড়ী তখন ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে দৌড়াইতেছিল।

* * * * *

(৯)

কুলীগণের বিকট হর্ষনাদে আমার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল, চক্ষু মেলিয়া ষ্টেশনের উজ্জ্বল আলোক দেখিয়া বুঝিলাম—গাড়ী কলিকাতায় আসিয়াছে। কষ্ট হইলেও তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলাম, এবং পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া পরিহিত বিধ্বস্ত বস্ত্রাদির ধূলি ঝাড়িতে লাগিলাম। ঘড়িটি বাহির হইয়া চেনের সঙ্গে কোটের গায়ে ঝুলিতেছিল, তুলিয়া একবার দেখিয়া আবার যথাস্থানে রাখিলাম, কপালের বামদিকে বেদনা অনুভব করিয়া হাত দিলাম, হাতে রক্ত লাগিল, বুঝিলাম—ভগ্ন কাচখণ্ডে কপালের কতকটা স্থান কাটিয়া গিয়াছে, রুমাল দিয়া ক্ষতস্থান চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম—হায়! হিরণ গাড়ী হইতে পড়িয়া নিশ্চয় খুন হইয়াছে—আমিই তাহার মৃত্যুর কারণ হইলাম! কি করি? ষ্টেশনমাষ্টার কিম্বা রেলওয়ে পুলিশকে সংবাদটা জানাইব কি? না, তাহাতে হিতে বিপরীত হইতে পারে, নিজমুখে অপরাধ স্বীকার করিয়া ফাঁসির দড়িতে গলা বাড়াইয়া দেওয়া হইবে, কাহাকেও কিছু না বলিয়া নিঃশব্দে পলায়ন করাই বিধেয়। কিন্তু আমি ত হিরণকে ফেলিয়া

দিই নাই, কিছুই করি নাই, সে টাল সামলাইতে না পারিয়া আপনি পড়িয়া গিয়াছে, তবে কেন আমার এই বিপদ !

এক ব্যক্তি বাহির হইতে আমার দরজার পাশে অগ্রসর হইয়া উঁকি দিয়া গাড়ীমধ্যে আমায় দেখিতেছিল। আমি ভাবিলাম—সকল যাত্রী চলিয়া গিয়াছে, আমার নামিতে বিলম্ব হওয়ায় কোম্পানীর কোন নিমকজীবী হয়ত আমায় অনুগ্রহ করিয়া সে কথাটা স্মরণ করাইয়া দিতে আসিয়া থাকিবে। সুতরাং আমি তাহার দিকে প্রথমতঃ চাহিলাম না। কিন্তু আগন্তুকের নীরবতায় আমার সে অনুমান দূর হইল। তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিক্ষেপমাত্র মুখখানিতে দেখিবার যোগ্য কিছু বিশেষত্ব দেখিতে পাইয়া একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তৎপ্রতি চাহিয়া রহিলাম। লোকটী এই দেশীয় বটে, তবে পরিধানে বিলাতী ধরণের অতি জীর্ণ ও পুরাতন পরিচ্ছদ; মুখের রংটী রৌদ্রদগ্ধ, নাসিকাটি প্রয়োজন অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অতিমাত্রায় বৃহৎ, শুষ্ক গণ্ডদ্বয়ের অস্তিত্ব মনোযোগী না হইয়া দেখিবার উপায় নাই; নাসিকা গহ্বর হইতে দীর্ঘরোমাবলী শিকড়ের মত নির্গত হইয়া বদনমণ্ডলের শুম্ফ-শোভা বলবৎ রাখিয়াছে, তন্নিম্নে বিরাট বিশাল বক্রদন্তপংক্তি নিয়ত তাম্বুল চর্ব্বণে রক্তরঞ্জিত দেখাইতেছে; ভাঁটার মত গোল চক্ষু দুইটী অতি উজ্জ্বল ও চঞ্চল।

যাহা হউক, প্রাণে তাহার সহানুভূতি ছিল, বলিল—"একি—রক্ত! রুমাল যে একেবারে ভিজিয়া গিয়াছে!"

সত্যই তখনও রক্তপড়া বন্ধ হয় নাই, রুমালখানি ভিজিয়া গিয়াছে, আর তাহা চাপা দেওয়া চলে না। আগন্তুক গাড়ীমধ্যে উঠিয়া আসিল এবং নিজের পকেট হইতে একখানি লাল রংএর পুরাতন রেশমী রুমাল বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া বলিল—"আমার এইখানি নিন্, ওখানি ত্যাগ করুন।"

তাহার মত অপরিচিত ও আগন্তুকের নিকট হইতে ঐ প্রকারের একখানি রুমাল লইতে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও অবস্থানুসারে বাধ্য হইলাম, কি করিব, অন্য উপায় ছিল না, ক্ষতস্থান হইতে রক্তধারা গণ্ড বহিয়া নামিতেছিল। নিজের সিক্ত রুমালখানি পকেটে রাখিয়া সেই রেশমী রুমালে আবার ক্ষতস্থান চাপিয়া ধরিলাম। আমাকে প্রায় টানিয়া তুলিবার চেষ্টায় আগন্তুক আমার হাত ধরিয়া বলিল—"চলুন বাহিরে যাই, আর এখানে বসিয়া থাকিয়া কি হইবে?"

উভয়ে গাড়ী হইতে নামিলাম। প্লাটফরমের বাহিরে যাইতে যাইতে সে বলিল—"নিকটেই আমার কোন পরিচিত স্থান আছে, সেখানে চলুন, আমি উপায় জানি, রক্তপড়া বন্ধ করিয়া আপনাকে কতকটা সুস্থ করিয়া দিব।"

আমি বলিলাম—"না, এখন তাড়াতাড়ি বাড়ী পৌছিতে পারিলেই ভাল হয়।"

"সেজন্য চিন্তা কি ; যখন কলিকাতায় আসিয়াছেন, অবশ্যই বাড়ী পৌছিতে পারিবেন।"

একখানি মোটর ডাকিয়া আমি তাহাতে আরোহণ করিলাম। আগন্তুকও আমার সঙ্গ ছাড়িল না, "চলুন, আমিও আপনাকে পৌছাইয়া দিয়া আসিতেছি"—বলিয়া আমার সম্মতির অপেক্ষা না রাখিয়া উঠিয়া বসিল। আমার তখন ভীত মন, তাহার এত অনুগ্রহে সন্দেহ বাড়ীতে লাগিল, সে আমার সঙ্গ ত্যাগ করিলেই আমি যেন হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচি। কিন্তু সে সেরূপ পাত্র নহে।

আমি বলিলাম—"তোমার রুমালখানি নষ্ট করিলাম কিছু মনে করিও না—"

সে বাধা দিয়া বলিল—"মনে করিবার কি আছে ? আমিও ত ভদ্রলোক, আপনার এই বিপদে—"

ভদ্রলোক!—আকৃতি ও পরিচ্ছদে তাহা অনুমান হইল না। যাহাহউক, প্রকাশ্যে বলিলাম—"কাল এই রুমালখানি ফেরত পাঠাইব, তোমার ঠিকানাটা আমায় দাও।"

সে বলিল—"সেজন্য ব্যস্ত হইবেন না, রুমাল আনিবার জন্য কাল সকালে কিম্বা বৈকালে আমিই গিয়া আপনার বাড়ীতে সাক্ষাৎ করিব। আপনার কার্ড সঙ্গে আছে কি ?"

আমার সন্দেহ আরও বাড়িল, ঠিকানা প্রকাশ করা সঙ্গত বিবেচনা না করিয়া নির্ব্বাক রহিলাম। কিন্তু আবার ভাবিতে লাগিলাম যে ঠিকানা না বলিলেও উহার কোন অসুবিধা হইবে না, কারণ আমার বাড়ীইত সে চলিয়াছে।

পথিমধ্যে কোনও এক দোকানের সম্মুখে গাড়ী থামাইয়া এক দোকানদারকে সে ডাকিল এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"সঙ্গে টাকা আছে কি?"

যন্ত্রণায় আমি তখন চক্ষু বুজিয়া পড়িয়াছিলাম, কথা কহিবারও যেন শক্তি বা ইচ্ছা ছিল না, মুদিত নেত্রেই এক হস্তে কোটের ভিতর পকেট হইতে একখানি পাঁচ টাকার নোট বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলাম, সে তাহা হাতে পাইয়া দোকানদারকে ফিস্ ফিস্ করিয়া কি বলিল, দোকানদার অল্পকাল মধ্যেই কি কি জিনিষ আনিয়া আগন্তুককে প্রদান করিল। তারপর আবার গাড়ী চলিল।

আগন্তুক আমার মুখের সম্মুখে একটী কাচের গ্লাস ধরিয়া বলিল—"এইটা খাইয়া ফেলুন, এখনি সুস্থ হইবেন।"

গন্ধে বুঝিলাম—তাহা ব্রাণ্ডি। দুশ্চিন্তা ও ক্ষতের যন্ত্রণায় তখন পিপাসায় আমার কণ্ঠ শুষ্ক, সুতরাং কোন দ্বিধা না করিয়া তাহার আদেশ পালন করিলাম, কি একটা ঠাণ্ডা ঔষধে সে আমার ক্ষত স্থান বাঁধিতে লাগিল, আমি

অনতিকাল মধ্যে ঘুমাইয়া বা নেশার আবেশে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলাম।

যখন চক্ষু মেলিলাম, দেখিলাম—আমার নিজ শয়ন কক্ষে শয্যার উপর শায়িত রহিয়াছি, পার্শ্বে ডাক্তার একদৃষ্টে আমার প্রতি চাহিয়া আছেন। প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ইন্দু আসিয়া ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন দেখিতেছেন?"

ডাক্তার বলিলেন—"অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন।"

আমি ধীরে ধীরে বলিলাম—"কেন, আমার কি হইয়াছে?"

ডাক্তার আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি রকম বোধ করিতেছেন?"

আমি উঠিবার চেষ্টা করিলাম, পারিলাম না। মাথায় যেন গুরুভার চাপান রহিয়াছে, অনেকক্ষণ চক্ষু মেলিয়া থাকিতে কষ্ট বোধ করিয়া আবার চক্ষু মুদিলাম। ডাক্তার আমার কপালে হাত দিলেন; বড় ঠাণ্ডা বোধ হইল, ভাল লাগিল। আমার মাথায় কি একটা ঠাণ্ডা ঔষধের মত লাগাইতে লাগাইতে ডাক্তারবাবু ইন্দুকে বলিলেন—"বড় দুর্ব্বল, খানিকটা গরম দুধ খাওয়াইতে পারিলে এখনি সুস্থ হইয়া উঠিবেন, ভয় নাই। এখন বিদায় হই, রাত্রে একবার সংবাদ লইব, কিন্তু বোধ হয় আর আমার আসিতে হইবে না।"

ডাক্তারবাবু চলিয়া গেলেন, ইন্দু গরম দুধ আনিবার জন্য পরিচারিকাকে আদেশ করিল। আমি ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিলাম, দেখিলাম—গৃহ মধ্যস্থ একখানি চেয়ার লইয়া দূরে বসিয়া ইন্দু খবরের কাগজ পড়িতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কয়টা বাজিয়াছে?"

ইন্দু সেইরূপ কাগজের উপরেই চক্ষু রাখিয়া উত্তর করিল—"সাড়ে তিনটা।"

"আমি কতক্ষণ এইরূপ আছি?"

"কাল রাত্রি আড়াইটা হইতে।"

পরিচারিকা দুগ্ধ লইয়া গৃহ প্রবেশ করিল, ইন্দু তাহা নিজ হস্তে লইয়া আমার সম্মুখে ধরিয়া বলিল—"একটু উঠিতে পারিবে কি?"

ইন্দু অতি যত্নের সহিত আমাকে অল্প উঠাইয়া কিঞ্চিৎ গরম দুগ্ধ পান করাইল। অল্পকাল মধ্যে একটা ঘাম হইয়া সত্যই শরীর কিছু হাল্‌কা বোধ করিলাম।

পরিচারিকা ইন্দুকে বলিল—"বেলা যে শেষ হইল, কখন স্নান করিবেন—খাইবেন কখন?"

আমি আশ্চর্য্য হইয়া ইন্দুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এখনও খাও নাই তুমি?"

পরিচারিকা উত্তর করিল—"কাল রাত্রি হইতে আপনার কাছেইত বসিয়া আছেন!"

ইন্দু পরিচারিকাকে বিদায় করিল। ইন্দুর ব্যবহারে তাহার উপর স্নেহে আমার হৃদয় ভরিয়া গেল, বেশী কিছু বলিতে পারিলাম না, শুধু একবার ডাকিলাম—"ইন্দু!"

স্বীয় বসনাঞ্চলে সে আমার মুখ মুছাইয়া দিতেছিল, ধীরে ধীরে বলিল—"বেশী কথা কহিও না, আর একটু ঘুমাও, আমি স্নানটা সারিয়া আসি।"

ইন্দু চলিয়া গেল। আমার আর ঘুম হইল না,—বেহারা আসিয়া বলিল—"এক ব্যক্তি সেলাম জানাইতেছে।"

বেহারাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কে—সে? নাম কি?"

বেহারা বলিল—"নাম বলিলেন না, বলিলেন—কাল ষ্টেসনে—"

আর বলিতে হইল না, সে স্বয়ং গৃহ প্রবেশ করিল—কল্যকার সেই অপরিচিত বন্ধু।

আমার সম্মতি না লইয়া এরূপ ভাবে একেবারে আমার শয়নকক্ষে উপস্থিত হওয়া ভদ্রতা বিরুদ্ধ, মনে মনে ভারি চটিলাম, কিন্তু হঠাৎ কিছু প্রকাশ করিলাম না। কেননা, কোন অহিত কার্য্যইত এ যাবত সে করে নাই, বরং অনেক উপকার করিয়াছে; নিজের সন্দিগ্ধ মনের দুর্ব্বলতায় শঙ্কিত হইতেছি।

আমার বলিবার অপেক্ষা না করিয়া সে নিজেই একখানি

চেয়ার টানিয়া লইয়া আমার শয্যার নিকটে বসিল। বেহারা চলিয়া গেল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“এই ঠিকানা তুমি কিরূপে জানিলে?”

সে খুব সহজ ভাবে বলিয়া ফেলিল—“কেন, আমিই ত কাল রাত্রে বাড়ী পর্য্যন্ত আপনাকে পৌছাইয়া দিয়া যাই, আপনার সে কথা মনে নাই, না থাকিবারই কথা, আপনি তখন অজ্ঞান। আজ একবার আপনাকে দেখিতে আসিয়াছি। আর শুধু দেখাও নয়,—কথা আছে।”

জীর্ণ ওভার কোটের ছেঁড়া পকেট হইতে একখানি বাঙ্গালা খবরের কাগজ বাহির করিয়া—“আজিকার বৈকালের কাগজ পড়িয়াছেন? এই দেখুন—” বলিয়া কাগজটী খুলিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে আঙ্গুল দিয়া আমায় দেখাইল। আমি কাগজটী হাতে লইয়া পড়িতে লাগিলাম। প্রথমে বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—“ভীষণ দুর্ঘটনা—চলন্ত রেলগাড়িতে ভারত বিখ্যাত বাঈজী হীরাবাই খুন!”

আর পড়িতে পারিলাম না, দৃষ্টি অন্ধকারময় হইয়া উঠিল, কাগজ ফেলিয়া আবার চক্ষু বুজিলাম। সে জিজ্ঞাসা করিল—“ও কি, পড়িলেন না?”

আমি নিতান্ত অনিচ্ছায় কথা কহিলাম—“না—পারিতেছি না, শরীর বড় খারাপ।”

গর্জ্জিত স্বরে সে বলিয়া উঠিল—"তা আমি জানি, শরীর যে খারাপ এবং কেন খারাপ—আমি বেশ ভালই জানি।"

আমি রুক্ষ স্বরে বলিলাম—"কি রকম! কে তুমি, নাম কি?"

বন্ধু-প্রবর তাহার অসমান দীর্ঘ দন্তগুলি সম্পূর্ণ প্রকাশ করিয়া আমার দিকে চাহিয়া হাস্যচ্ছন্দে কহিতে লাগিল—"নাম জানিয়া আর কি হইবে? এই পর্য্যন্ত জানিয়া রাখুন যে আমি একজন গোয়েন্দা, তবে সরকারী নয়—বে-সরকারী।"

ডিটেক্‌টিভ্! আমার সন্দেহ সফলতায় দাঁড়াইয়াছে। ধীরে ধীরে বলিলাম—"তা—আমার নিকট কি প্রয়োজন?"

এইবার সে চরা সুর ধরিল—"প্রয়োজন কি—তা আপনি নিজে বুঝিতেছেন না? কাগজের লেখা ঐ ঘটনাটার সহিত আপনার কি কোন সম্বন্ধ নাই?"

"ও ঘটনার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ?"

"সম্বন্ধ এই যে—আপনিই হীরাবাঈর হত্যাকারী।"

"মিথ্যা কথা।"

"মিথ্যা বলিবেন না, সত্য কথা।"

"কখনও না, আমি নির্দ্দোষ।"

"আপনি হত্যাকারী এবং আমিই তাহার সাক্ষী।"

তাহার উচ্চৈঃস্বরে এবং বলিবার দৃঢ়তা ও ভঙ্গীতে আমি কতকটা দমিয়া গেলাম, বলিলাম—"দেখুন, আস্তে বলুন।"

সুরটা অপেক্ষাকৃত নরম করিয়া সে বলিতে লাগিল—"আমায় গোপন করিবেন না, সব জানি আমি, ইচ্ছা করিলে এই মুহূর্ত্তে আপনাকে হাতকড়ি পরাইবার ব্যবস্থা করিতে পারি।"

আমি বলিলাম—"তোমার ভুল ধারণা, ঈশ্বর সাক্ষী—আমি নির্দ্দোষ।"

"এতবড় অপরাধটাকে আপনি নির্দ্দোষ বলিতেছেন!" বলিয়া সে চেয়ার ছাড়িয়া আমার শয্যাপ্রান্তে উঠিয়া বসিল এবং আমার দিকে কতকটা ঝুঁকিয়া পড়িয়া আরও নিম্ন স্বরে বলিতে লাগিল—"আপনি আমায় যা-ই ভাবুন, আমি আপনার মিত্র ভিন্ন শত্রু নই। সেই ট্রেনে আপনার পার্শ্বস্থ কক্ষে আমিও ছিলাম। হীরাবাঈ আপনার কক্ষে উঠিয়াছিল, তাহাও আমি দেখিয়াছি, আপনাদের উচ্চকণ্ঠ শুনিয়াছি—আপনারা বিবাদ করিতেছিলেন। আমি জানালা হইতে গলা বাহির করিয়া দেখিলাম—আপনি বলপূর্ব্বক হীরাবাঈকে গাড়ী হইতে ফেলিয়া দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ দরজা ধাক্কার বড় একটা শব্দে সব চুপ হইয়া গেল, আমি বিস্ময়ে অবাক্ হইলাম!"

আমি বলিলাম—"আমি তাহাকে ফেলিয়া দিয়াছি? তবে তুমি কিছুই দেখ নাই!"

সে বলিল—"প্রয়োজন হইলে বিচারালয়ে যাহা বলিতে হইবে, তাহাই আপনাকে শুনাইলাম।"

ঐরূপ সাক্ষী দেওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব কার্য্য মনে করিলাম না, সুতরাং আমি আরও দমিয়া গেলাম ; পরে বলিলাম —"আমি ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিলেই কি তুমি সুখী হইবে ?"

"সে অভিপ্রায় থাকিলে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এত কথা কহিতাম না"—তাহার দন্তনিম্নে হাসি ফুটিল ; পকেট হইতে একখণ্ড অর্দ্ধদগ্ধ বর্ম্মা চুরুট বাহির করিয়া মুখে দিয়া অগ্নি সংযোগের পর ধীরে ধীরে আবার বলিতে লাগিল— "দেখুন পরেশ বাবু ! আমার উদ্দেশ্য—এই ধরুণ—প্রত্যুপকার ; আমি যদি সাক্ষী না দিয়া ঘটনাটা চাপিয়া রাখিয়া আপনার উপকার অর্থাৎ জীবন রক্ষা করি, কোন প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা আমি করিতে পারি কি না ?"

"বল—কি তোমার অভিলাষ ?"

"অভিলাষ যে কিছু আর্থিক রকমের, তাহাও বোধ হয় আপনি বুঝিয়াছেন।"

"কত টাকা চাও তুমি ?"

"সে বিবেচনাও—আপনার বর্ত্তমান স্বচ্ছলতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া—আপনিই করিবেন।"

"তবুও—তোমার প্রয়োজন ?"

"আপাততঃ—হাজার খানেক হইলেই—"

"হাজার টাকা !"

"হাঁ, তাহাতেই কিছুদিন চলিয়া যাইবে।"

"কমে হইবেনা ?"

"একটা কাণা কড়ি কম দিলেও আমি লইব না।"

"অত টাকা আমি দিতে পারিব না।"

সে রাগত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"তবে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিবার জন্য প্রস্তুত হউন, আমি চলিলাম।"

আমি হতাশ হইয়া বলিলাম—"বেশ, হাজার টাকাই দিতেছি, ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের উপর এক চেক—"

"চেক ফেকের ধার ধারি না, আমি চাই নগদ টাকা, তবে খুচ্‌রা নোটেও ক্ষতি নাই।"

ডাক্তারকে ভিজিট দিয়া চাবির তাড়া আমার শয্যাপার্শ্বেই ইন্দু রাখিয়া গিয়াছিল, ক্যাশবাক্স খুলিয়া একশত টাকার দশখানি নোট তাহার হাতে দিয়া বলিলাম—"এই লও, গণিয়া দেখ।"

আহ্লাদে হাসিয়া তাড়াতাড়ি হাত বাড়াইয়া সে টাকা গ্রহণ করিল এবং ওভার কোটের ভিতর পকেটে রাখিয়া কোটের বোতাম আটকাইতে আটকাইতে বলিল—"না-না, গুণিতে হইবে না, অত অবিশ্বাস আপনাকে আমি করিনা।"

টাকাটা অত তাড়াতাড়ি তাহাকে দেওয়া যে উচিত হয় নাই, সে কথাটা পরে মনে হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম—"টাকা ত পাইলে; কিন্তু যদি তুমি প্রতিশ্রুতি রক্ষা না কর ?"

সে আবার হাসিয়া উত্তর করিল—"সে আমার ধর্ম্ম; সে সম্বন্ধে আমাকে আপনার বিশ্বাস না করিয়া উপায় নাই"—

বলিতে বলিতে দ্রুতপদে সে প্রস্থান করিল, আমিও আবার ধীরে ধীরে শুইয়া পড়িয়া—কিসে কি হইল—ভাবিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে ইন্দু ফিরিয়া আসিল এবং আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া গায়ে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ঘুমাও নাই দেখিতেছি, এখন একটু ভাল বোধ করিতেছ?"

আমি বলিলাম—"হাঁ।"

আমার গায়ের ও কপালের উত্তাপ পরীক্ষা করিতে করিতে ইন্দু আবার বলিল—"কাল রাত্রিতে কি হইয়াছিল তোমার?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কেন বল দেখি?"

সে বলিতে লাগিল—"কাল শেষ রাত্রিতে যে অবস্থায় তুমি আসিয়া পড়িয়াছিলে! কাপড়, জামা সমস্ত ধুলি মাখা, কোটের একটাও বোতাম নাই, ঘড়িটী ছিল বটে—চেন ছড়াটী নাই, মুখে মদের গন্ধ, কপালের কাটা জায়গাটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, জ্ঞান নাই, সমস্ত মুখে রক্ত! কে একটা লোক মোটরে করিয়া তোমায় তদবস্থায় এখানে দিয়া তখনি চলিয়া গেল, পকেটে মনিব্যাগটা পর্য্যন্ত ছিল না।"

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম—"কেন! ঘড়ী, চেন, মনিব্যাগ—সমস্তই ত সঙ্গে ছিল—আফিসের ঠিকানায় কয়েকখানি কার্ডও ছিল!"

"কিছুই পাই নাই; কত টাকা ব্যাগে ছিল?"

"মনে নাই, পঞ্চাশ কি ষাট হইবে।"

"পকেটে তোমার কিছুই পাই নাই।"

বুঝিলাম—আমার অজ্ঞানাবস্থায় নবপরিচিত গোয়েন্দা বন্ধুই সব সরাইয়াছে!

ইন্দু বলিতে লাগিল—"অনেক রাত্রি অবধি তোমার অপেক্ষায় জাগিয়াছিলাম। বারটার মধ্যেও যখন তুমি ফিরিলেনা, ভাবিলাম—তোমাকে আজ তাঁহারা ছাড়িয়া দেন নাই, আজ তুমি আসিবেনা, আমি শুইয়া পড়িলাম। কিন্তু ঘুম হইল না, মন কেমন খারাপ হইয়া উঠিল। অনেকক্ষণ বিছানায় এপাশ ওপাশ ছট্‌ফট্‌ করিয়া রাত্রি তিনটার পরে একটু তন্দ্রামত যেমন আসিয়াছে, অমনি নীচে হইতে গণ্ডগোলের শব্দে চমকিয়া উঠিলাম, তখনই নীচে গিয়া তোমায় তদবস্থায় দেখিতে পাই। চাকরদের সাহায্যে তাড়াতাড়ি তোমায় ঘরে তুলিয়া আনিয়া ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইলাম। ডাক্তার আসিয়া বলিলেন—'ভয় নাই, অতিরিক্ত মদ খাওয়ায় এইরূপ ঘটিয়াছে।' তোমার অবস্থা দেখিয়া তাহা অবিশ্বাস করিলাম না।" পরে কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গচ্ছলে আবার বলিল—"কাল ছিলে কোথায়? বলনা, বলিতে কিছু বাধা আছে কি?

আশঙ্কা কম্পিত কণ্ঠে আমি বলিলাম—"ইন্দু! আমার বড় বিপদ।"

ইন্দু চমকিয়া উঠিয়া বলিল—"কি বিপদ ?"

আমি বলিতে পারিতেছি না, চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। ইন্দু তাহার বস্ত্রাঞ্চলে আমার চক্ষু মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল—"বলনা—আর্থিক কিছু ?"

"আর্থিক কিছু ক্ষতিকে আমি গ্রাহ্য করি না।"

"তবে ?"

"যে বিপদে পড়িয়াছি, মুখে তাহা বলিতে পারিতেছি না; ইন্দু—মিথ্যা হত্যার কলঙ্কে আমার জীবন বিপন্ন।"

"য়্যাঁ!"—বলিয়া অত্যধিক আশঙ্কায় ইন্দুর সুন্দর মুখখানি নীলবর্ণ হইয়া উঠিল, ভীতভাবে আমায় বলিল—"কি হইয়াছে খুলিয়া বল।"

"বলিতে হইবেনা, এ বেলার বাংলা কাগজ আসিয়া থাকিলে পড়িয়া দেখ।"

বৈকালের কাগজ টেবিলের উপরেই ছিল, ইন্দু তাহা লইয়া খুলিয়া ফেলিল, আমি অঙ্গুলী নির্দ্দেশে রেল গাড়ীর দুর্ঘটনা শীর্ষক স্থানটী তাহাকে দেখাইয়া দিলাম। সে পাঠ শেষ করিয়া কিছু বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এই ঘটনায় তোমার কি সম্বন্ধ ?"

"সম্বন্ধ ? হায়! আমিই হয়ত হত্যাকারী সাব্যস্ত হইব।"

অতি বিস্ময়ে ইন্দু বলিয়া উঠিল—"অসম্ভব।"

"কি অসম্ভব ?"

"তুমি কখনও এই কাজ করিতে পার না।"

"তবে স্থির হও, বসিয়া সব কথা শোন।"

রেলগাড়ীর ঘটনা আনুপূর্ব্বিক সমুদয় প্রকাশ করিয়া বলিলাম। গোয়েন্দা বন্ধুর সম্মিলন এবং এই মাত্র তাহাকে অর্থ প্রদানের কাহিনী—কিছুই গোপন করিলাম না। ইন্দু বেশ ধীরভাবে মনোযোগের সহিত সমস্ত ঘটনা শুনিল। পরে একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা, হঠাৎ দেখিয়াই তুমি হিরণকে চিনিয়াছিলে?"

আমি বলিলাম—"হাঁ।"

ইন্দু আবার প্রশ্ন করিল—"সে কি সত্যই তোমায় ভাল বাসিত?"

আমি বলিলাম—"জানি না।"

ইন্দু বলিল—"আমি জানি।"

"তুমি জান?"

"হাঁ জানি! তোমরা পুরুষ, স্ত্রীচরিত্র সহজে বুঝিতে পারনা। নিশ্চয় জানিও—তোমার জন্য সে পাপিষ্ঠার প্রাণে বিন্দুমাত্র ভালবাসা ছিল না।"

"হাঁ—হাঁ, তাইত! তা'ত ছিলই না; ভালবাসিলে কেহ এমন বিপদে ফেলিতে পারে? এখন সে কথা বেশ হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছি।"

আমার কথা শুনিয়া—এই বিপদের সময়েও—ইন্দু ঈষৎ না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। কিছু কাল উভয়েই নিস্তব্ধ রহিলাম। পরে ইন্দু বলিতে লাগিল—"আমার মনে হয়, তোমার গোয়েন্দা বন্ধু লোক ভাল নয়, তাহাকে প্রশ্রয় দিয়া ভাল কর নাই।"

আমি বলিলাম—"কিন্তু যদি পুলিসের নিকট পুরস্কারের লোভে সে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করে?"

"তোমার নিকট টাকা পাইলেও সে যে পুলিসকে কিছু বলিবে না—তাহা ভাবি ও না। কাল রাত্রিতে তোমায় মদের নেশায় অজ্ঞান করিয়া তোমার চেন, মনিব্যাগ এয়ং ঠিকানার কার্ড এই ব্যক্তিই লইয়াছে।"

"আমারও তাহাই মনে হয়।"

"তবে আজ আবার তাহাকে টাকা দিলে কেন?"

"তা ভিন্ন আমার উপায় কি?"

"এখনি কোন বড় উকিল বা বারিষ্টার ডাকাইয়া সমুদয় সত্য ঘটনা বলিয়া তাঁহার উপদেশ মত কার্য্য কর।"

"সে সময় এখনও আসে নাই।"

"কেন?"

"আমি সেই গাড়ীতে ছিলাম—এ কথা আগে হইতে প্রকাশ করা কি ভাল?"

"কিন্তু সেই গোয়েন্দা কিছুইত অপ্রকাশ রাখিবে না?"

"তুমি বলিয়াছ ঠিক, আমিও এখন তাহা বুঝিতেছি—কিন্তু উপায় স্থির করিতে পারিতেছি না।"

ইন্দু এইবার আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া, বেদনা ও সহানুভূতি সিক্ত স্বরে বলিতে লাগিল—"তুমি বৃথা কোন চিন্তা করিও না, বিপদ ভগবান্ পাঠাইয়া থাকেন, আবার তিনিই মানুষকে মুক্ত করেন, উপায় তিনিই করিয়া দিবেন। আমরা কোন দিন কাহারও কোন অনিষ্ট করি নাই, আমাদেরও কোন অনিষ্ট হইবে না, তুমি নির্দ্দোষ,—ভগবানে নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাক।"

ইন্দুর কথা শুনিয়া সত্যই মনে যেন আমার বল আসিল, ঈশ্বরে বিশ্বাস বাড়িল, সমুদয় চিন্তাভার তাঁহার চরণোদ্দেশে নিবেদন করিয়া চক্ষু মুদিয়া একমনে বিঘ্ন-বিনাশনকে ডাকিতে লাগিলাম।

* * * * * *

৬

[১০]

তিন দিন পরে আমি উঠিয়া শয়ন গৃহের বাহিরে বারন্দায় বসিয়াছি—সকাল বেলা, তখনও আটটা বাজে নাই। প্রথম শীতের প্রভাত-কিরণে বসিয়া চা পান করিতেছি, প্রাণের অবসাদ ভাবটা অনেকাংশে কমিয়াছে। ইন্দু কাছে বসিয়া মাসিক কাগজ হইতে প্রবন্ধাদি পড়িয়া আমায় শুনাইতেছে। মীনা দূরে ধাত্রীর সঙ্গে খেলা করিতেছে।

বেহারা আসিয়া একখানি লেফাপা সম্মুখে ধরিয়া দাঁড়াইল; পত্রের মুখ বন্ধ নহে, খুলিয়া পড়িলাম—"সেই ভদ্রলোক, যিনি আপনার সঙ্গে একই ট্রেনে আসিয়াছিলেন।"

চিঠিখানি ইন্দুকে পড়িতে দিয়া বেহারাকে জিজ্ঞাসা করিলাম —"আছে কোথায়?"

বেহারা উত্তর করিল—"বসিবার ঘরে।"

ইন্দু বেহারাকে বলিল—"যাও, আসিতে বল।"

বেহারা চলিয়া গেল। আমি ইন্দুকে জিজ্ঞাসা করিলাম— "তুমিও এখানে থাকিবে?"

ইন্দু বলিল—"দোষ কি?"

আমি বলিলাম—"মন্দ নয়, থাক তুমি এখানে, রাস্কেল্‌টা আবার আমায় বিরক্ত করিবে।"

"তোমাকে সে পাইয়া বসিয়াছে, ছাড়িবে কেন ?"

বন্ধুপ্রবর আগমন করিল এবং অভ্যাস মত কাহারও অভ্যর্থনা বা অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়া নিজেই একখানি আসন টানিয়া লইয়া আমাদের নিকটে বসিল। এবার বেশ ফিট্‌ ফাট্‌, পূর্ব্বের মলিন বসন আর নাই, পোষাক ও পরিচ্ছদ সাহেবী ধরণের এবং একেবারে নূতন। বুঝিলাম—আমার প্রদত্ত টাকার কতকাংশ এইদিকে ব্যয়িত হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম—"তার পর, কি প্রয়োজন ?"

টুপিটী বাম করে হাঁটুর উপর রাখিয়া দক্ষিণ করে একখানি নূতন রুমালে মাথার ঘাম মুছিতে মুছিতে গম্ভীর ভাবে সে বলিতে লাগিল—"প্রয়োজন অবশ্যই আছে; জানেন ত,—যে কার্য্য করি, তাহাতে সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতে হয়, বিনা প্রয়োজনে মূল্যবান সময় নষ্ট করি না।"

আমি বলিলাম—"তাহা হইলে বক্তব্যটা—"

ইন্দুর উদ্দেশ্যে সে বলিল—"ইঁহার সম্মুখে—"

আমি বলিলাম—"স্বচ্ছন্দে; স্ত্রীর নিকট গোপন করিবার আমার কিছুই নাই।"

সে মাথা নাড়িয়া অর্দ্ধহাস্যে বলিল—"তা-বটেইত, তা-বটেইত; আজ আমি দু'হাজার টাকা চাই।"

আমি বলিলাম—"আমি এখানে দানছত্র খুলি নাই।"

"তা—আপনিই জানেন! কিন্তু টাকা আমার চাই-ই।"

"আর এক পয়সাও না।"

"বৃথা সময় নষ্ট করিবেন না, আমায় বিদায় করুন।"

"বিদায় হইতে ত কোন বাধা দেখি না, গেলেই হয়।"

"দেখুন পরেশ বাবু! বেশী কথা কহিবেন না, এই ব্যাপার লইয়া সহরে কি রকম হুলুস্থূল পড়িয়া গিয়াছে—কাগজে পড়িয়াছেন ত? আসামীর সন্ধানে পুলিস ঘুরিতেছে, হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা হইয়াছে।"

পরে ইন্দুর দিকে চাহিয়া সে আবার বলিতে লাগিল—"আপনিও বুঝিয়া দেখুন মিসেস্, এই ঘটনার সাক্ষী আমি, এখন আমার সঙ্গে বিবাদ করিয়া বিপদকালে নির্ব্বোধের কার্য্য করিতেছেন কি না? আমার কথা না শুনিলে ফাঁসিকাঠে ঝুলিতে হইবে। আমার একটী মুখের কথার মূল্য—পুলিসের বিজ্ঞাপিত হাজার টাকা, সঙ্গে সঙ্গে আপনার হাতে হাতকড়ি। বেশ ভাল রকম ভাবিয়া দেখুন।"

আমি বলিলাম—"বেশ ভাল রকমই ভাবিয়া দেখিয়াছি; তোমার অনুগ্রহে নির্ভর করিয়া কোন উপকার নাই। আমি যদি নির্দ্দোষ হই—ভগবান্ আমায় রক্ষা করিবেন। তোমাকে চিনিতে আর বাকী নাই—সব জানিয়াছি। পুলিসের ঘোষিত পুরস্কারের লোভ তুমি ছাড়িতে পার নাই, তোমার মত

লোকে তাহা পারে না। তুমি আমায় রক্ষা করিবে না—ফাঁকি দিয়া কিছু টাকা মারিবার ফান্দতে ঘু'রতেছ। তুমি বিদায় হও, আমি আমার অদৃষ্টের জন্য প্রস্তুত হইয়াছি।"

ইন্দু বলিল—"না—না, আমার কথা শুন—"

আমি তাহাকেও বাধা দিয়া বলিলাম—"না ইন্দু, কোন কথা নয়—আমি যদি নিরপরাধ হই, নিশ্চয়ই রক্ষা পাইব।"

গোয়েন্দা বন্ধু বলিল—"আপনি কি শুনেন নাই যে সময় সময় নিরপরাধ ব্যক্তিও বিচার বিভ্রাটে দোষী সাব্যস্ত হইয়া দণ্ডিত হয়?"

আমি তখন উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিলাম—"তা শুনিয়াছি; যদিই বা সেই রকম মরিতে হয়—মনে প্রাণে ত আমি নিষ্পাপ—মানুষের দেওয়া দণ্ড হাসিমুখে সহ্য করিব। তোমাদের মত লোকের হাতের পুতুল হইয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা সে মরণ শ্লাঘনীয়। পৃথিবীতে কে না মরিবে? আজ আর আমার সে জড়তা—প্রাণের সে সঙ্কীর্ণতা নাই, আপনার অবস্থা আপনি বুঝিতে পারিতেছি, নিজেকে অত কাপুরুষ ভাবিতে আমার লজ্জা হয়।"

সে বিরক্ত হইয়া বলিল—"তবে কি টাকাটা দেবেন না?"

আমি বলিলাম—"আর একটী পয়সাও আমার নিকট হইতে পাইবে না, সে প্রত্যাশা করিও না।"

বন্ধু কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ করিয়া বলিল—"আচ্ছা দু'হাজার না হয়, এক হাজারই দিন।"

আমি বলিলাম—"না।"

"আপনাকে ধরাইয়া দিয়া পুলিসের নিকট হইতেও আমি হাজার টাকা পাইতে পারি। ইচ্ছা নয় যে—তা করি; একটা ছা'পোষা ভদ্রলোকের জীবন—কাজ কি? আপনি না হয় পাঁচ শ' দিন।"

"বলিয়াছি ত—এক পয়সাও না।"

সে ইন্দুকে বলিল—"দেখুন মিসেস্, তবে আর আমার দোষ নাই, আপনাকে জানাইয়া রাখি।"

ইন্দু তাহাকে বলিতে লাগিল—"আমার একটা কথা শুনুন; —তিন দিন হইল, আপনি আমাদের নিকট হইতে এক হাজার টাকা লইয়াছেন, আবার আজ দু'হাজার চাহিতেছেন, আমরা দিতে প্রস্তুত। দু'হাজার কেন, আরও বেশী দিব, জীবনের তুলনায় টাকা অতি তুচ্ছ। কিন্তু আপনি যে এই মিথ্যা কথা এখনও প্রকাশ করেন নাই এবং ভবিষ্যতেও করিবেন না, তাহার প্রমাণ কি?"

নিতান্ত বক-ধার্ম্মিকের মত দন্তে জিহ্বা কামড়াইয়া সে বলিল—"আরে ছি-ছি, সে কি একটা কথা? আপনার টাকা খাইব, আবার আপনারই অপকার করিব?

ইন্দু বলিল—"অনেকে যে করে?"

সে বলিল—"তাহাদের কথা স্বতন্ত্র; আমায় বিদায় করুন, অনেক বেলা হইল, না হয়—আড়াই শ'ই দিন্।"

ইন্দু বলিল—"আমার বিশ্বাস—আপনিও সেই স্বতন্ত্র দলেরই লোক।"

সে উত্তর করিল—"কিসে বুঝিলেন?"

ইন্দু বলিল—"নির্দ্দোষীকে এরূপ নির্য্যাতন করিতে কোন ভদ্রলোক পারেন না।"

সে বলিল—"টাকা পাইলে আমিও ভদ্রতা দেখাইতে জানি।"

ইন্দু বলিল—"আপনার মতলব আমরা বুঝিয়াছি। আপনি দু'দিকেই টাকা খাইবার চেষ্টায় ঘুরিতেছেন।"

সে কিছুক্ষণ অবাক হইয়া বলিল—"সে কি কথা!"

ইন্দু বলিল—"ঠিক কথা; তবে শুনুন,—পুলিস আফিসের কোন লোক আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, তিনি বলিয়াছেন—আপনার মত চেহারার একটী লোক রেল গাড়ীতে হীরাবাইজীর হত্যাকারীকে ধরাইয়া দিবে বলিয়া পুলিসের নিকট হইতে টাকা লইয়াছে, সে লোক কি আপনি?"

বিস্ময়ে বন্ধুবর চক্ষু কপালে তুলিয়া কিছুকাল নির্ব্বাক রহিল, পরে বলিল—"না-না, সে আমি নই—আমি নই, অন্য কেহ হইতে পারে।"

ইন্দু বলিল—"আসামির সহিত একই ট্রেণে ভ্রমণ করিয়াছেন বলিয়া পুলিসের নিকট আপনি পরিচয় দেন নাই ?"

বন্ধু উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—"কবে ? না না, আমি তবে বিদায় হই, আপনারা ত দিবেন না, কাজেই অন্য উপায় দেখিতে হইবে। আমি টাকা চাই, ইহাতে যাহার ভাল হয় হইবে, মন্দ হয় হইবে।"

প্রস্থানের জন্য সিঁড়ি পর্য্যন্ত যাইয়া আবার ফিরিয়া সে বলিতে লাগিল—"কিন্তু একশত টাকা হইলেও আমি আপাততঃ চাপিয়া যাইতাম।"

আমি উচ্চৈঃস্বরে বলিলাম—"তুমি দূর হও।"

সে নামিতে না নামিতেই সিঁড়িতে অনেক লোকের জুতার শব্দ শুনা গেল। ইন্দু চঞ্চল হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"ও কি! এত লোক কেন আসে ?"

আমি কিছু উত্তর করিবার পূর্ব্বেই একজন পুলিস ইন্‌স্পেক্টার এবং কয়েকজন কন্‌ষ্টেবল সহ বন্ধু মহাশয়ের পুনরাবির্ভাব হইল।

ইন্‌স্পেক্টারবাবু আমাকে প্রশ্ন করিলেন—"আপনিই কি ইঞ্জিনিয়ার পরেশবাবু ?"

বন্ধু মহাশয় তাড়াতাড়ি অগ্রবর্ত্তী হইয়া বলিল—"হাঁ-হাঁ—

আমি সনাক্ত করিতেছি—ইনিই সেই পরেশবাবু—রেলগাড়ীর স্ত্রীহত্যাকারী।”

ইন্‌স্পেক্টারবাবু আমাকে বলিলেন—“মাফ্‌ করিবেন, অন্তঃপুরে আসিতে বাধ্য হইয়াছি—আমরা সরকারের চাকর, আপনার নামে ওয়ারেণ্ট আছে, রেলগাড়ীর দুর্ঘটনা সংক্রান্ত ব্যাপারে আমি আপনাকে বন্দী করিলাম।”

ইন্দু লজ্জা ভুলিয়া আত্মহারার মত উচ্চকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল, কন্‌ষ্টেবলগণ আমার হাতে হাতকড়ি পরাইতে লাগিল।

পুলিনের কথা।

[১১]

বৌবাজারের একখানি ছোট ও সুন্দর বাড়ীতে সোণাকে গৃহকর্ত্রী সাজাইয়া তিন দিন সেখানে আমায় অজ্ঞাতবাস করিতে হইল।

কয়দিন ধরিয়া অনবরত বৃষ্টি হইতেছিল। চেহারাটা অনেকটা শুষ্ক ও রুক্ষ করিয়া লইয়া একদিন সকাল বেলার এক পশলা খুব বড় বৃষ্টি মাথায় করিয়া ধরণীবাবু ও রমার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। হঠাৎ আমাকে দেখিয়া তাঁহারা নিতান্ত বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। বোম্বাই সহরে প্লেগাক্রান্ত হইয়া এতদিন হাঁসপাতালে পড়িয়াছিলাম—ইহাই তাঁহারা জানিতেন। পূর্ব্বে সংবাদ না দিয়া এরূপ ভাবে আমি আসিব—তাঁহাদের ধারণা ছিল না। আমি বলিলাম—হাঁসপাতালে আর মন টেকে না বলিয়াই কোন সংবাদ না দিয়া এমনভাবে তাড়াতাড়ি আসিয়াছি।

আসনে বসিয়া উভয়ের কুশল সম্ভাষণের পর জিজ্ঞাসা করিলাম—"মা কোথায়?"

কেহ কোন উত্তর দিল না, কিন্তু রমা হঠাৎ ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া

উঠিল, রমার কান্না দেখিয়া ধরণীবাবুরও মুখ বিষণ্ণ হইল, এক দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে তিনি মাথা নীচু করিলেন। বিস্মিত হইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"ও কি রমা, কাঁদিতেছ কেন?"

রমা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল— "পুলিন-দা, মা চলিয়া গিয়াছেন।"

আমি প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিলাম—"সে কি! কোথায়?" রমা তেমনি ভাবে বলিল—"স্বর্গে।"

ধীরে ধীরে টেবিলের উপর মাথা নত করিয়া আমি কাঁদিতে লাগিলাম। কি জানি—কান্নাটা কেন তখন জোর করিয়া আনিতে হয় নাই—আপনিই আসিয়াছিল! বুকে যেন সত্যই একটা বেদনা অনুভব করিয়াছিলাম। এই রমার মাকে আমিও মা বলিতাম। ভূমিষ্ঠ হইবার চৌদ্দ বৎসর পরে এই মমতাময়ীর কোল পাইয়া আমি মাতৃস্নেহের মধুর আস্বাদ অনুভব করিয়াছিলাম।

ধরণীবাবু জানাইলেন—এক বৎসর হইল এই দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, দুঃসংবাদ বলিয়াই—বিদেশে আমায় লেখেন নাই। হঠাৎ তিনদিনের জ্বরে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল, চিকিৎসায় কোন ফল হয় নাই; মৃত্যুকালে বেশ জ্ঞান হইয়াছিল, অনেকবার 'পুলিন—পুলিন—' বলিয়া আমায় দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সেদিনটা শোকস্মৃতিতে কাটিয়া গেল। অবশ্য আমার দুঃখ অতি অল্পকাল মধ্যেই মুছিয়া ফেলিয়াছিলাম, ধরণীবাবু ও রমার মনের অনুসরণ করিয়া সমস্ত দিনরাত্রি শোকাভিনয় করিতে হইল। পরদিন হইতে নানারূপ বিলাতী গল্প বলিতে আরম্ভ করিয়া আবার আমি তাঁহাদের হাসিমুখ দেখিতে পাইলাম।

কিন্তু রমা আর সে রমা নাই— অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে! আমার লুব্ধ দৃষ্টি তাহাতে পুলকিত হইল। এখন রমা যৌবনের মধ্যবর্ত্তিনী, প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বয়সানুযায়ী বিশিষ্টতা বিকশিত হইয়া পুরুষকে পতঙ্গের মত প্রলুব্ধ করে! বিখ্যাত সুন্দরীগণের পর্য্যায় ভুক্ত না হইলেও তাহার নির্ম্মল শ্যামকান্তিখানি এমন একটী লাবণ্যময় পবিত্র-শ্রী মণ্ডিত,— দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। ছেলেবেলার সেই ছুটাছুটি, দুষ্টামী, যখন তখন উচ্চহাস্য রমার আর নাই, মুখে এখনও একটু মৃদু হাসি লাগিয়া আছে—কিন্তু তাহা বড় ধীর—বড় নম্র; বিনা প্রয়োজনে বেশী কথা বলে না।

স্বদেশীর বাতাস কলিকাতায় তখন প্রবল ভাবে বহিতেছিল, রমা খুব স্বদেশহিতৈষিণী, কলেজ ছাড়িয়াছে, ঘরে বসিয়া চরকায় সূতা কাটে; খদ্দরের সাড়ীখানিতে তাহাকে বড় সুন্দর মানাইয়াছিল।

সোণার সঙ্গে রমার তুলনা করা যায় না; সোণা রূপসী—বিলাস বাসরের শ্রেষ্ঠ গোলাপ, রমা সেরূপ নয়—সে যেন পূজারীর ভক্তি অঞ্জলির পবিত্র সেফালিটি!

ধরণীবাবুর সহিত না হইলে এখন আর রমা আমার কাছে একলা বড় আসে না। সাংসারিক কার্য্যে তাহার মায়ের কর্ত্তৃত্ব ভার সমস্তই তাহার উপর পড়িয়াছে। কিন্তু তথাপি দিনে দিনে বুঝিতে পারিলাম—রমার দৃষ্টি আমার উপর প্রসন্ন নহে। সেই বিদেশী বয়কটের দিনে আমার বিলাতী চাল চলনে রমা সন্তুষ্ট হইত না, বরং সময় সময় বিরক্ত হইত। অনেক প্রতিবাসিনী বালিকা রমার বন্ধু ও ছাত্রী জুটিয়াছিল, ইহারা সকলেই কুমারী এবং গান্ধী মন্ত্রে দীক্ষিতা। প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে তেতালার ঘরে ইহাদের বৈঠক বসিত।

রমার জন্য বিলাত হইতে কিছু উপহার আনিয়াছিলাম, রমাকে তাহা দিতে সাহস হইল না। বরং রমার ছাত্রী সম্প্রদায় আমাকে বাড়ীতে খদ্দর বসন ধারণ করিতে বাধ্য করিল। কি করিব—ইহাতেও যদি রমার দৃষ্টি কিঞ্চিৎ সুপ্রসন্ন হয়।

ধরণীবাবু চিরদিনই কর্ম্মঠ ব্যক্তি। এবার আসিয়া তাঁহাকে আরও পরিশ্রমী দেখিলাম। নিয়তই কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া সম্ভবতঃ পত্নীর বিরহ বেদনা ভুলিতে চেষ্টা করিতেন।

ধরণীবাবু কোর্টে গেলে উপরে যখন রমার মহিলা-মজলিস বসিত, আমিও তখন বৌবাজারের ট্রাম হইতে সোণার বাসার নিকটে নামিতাম। সোণা একাকিনী—আমার প্রত্যাশায় বিষণ্ণ হইয়া বসিয়া থাকিত, আমাকে পাইলে আহ্লাদে হাসিয়া উঠিত, আমিও অমনি হাসিয়া তাহাকে বুকে তুলিয়া লইতাম।

কিছুদিন পরে আমাকেও প্রত্যহ ধরণীবাবুর সঙ্গে কোর্টে বাহির হইতে হইল। তখন দিনের বেলায় সোণা-সম্মিলন অসম্ভব হইয়া উঠিল। বর্ষার রাত্রিতে প্রত্যহ আবার বাহির হইবারও সুযোগ ঘটিত না—সন্ধ্যার পর প্রায়ই ধরণীবাবুর নিকট বসিয়া গল্পাদি ও নানাবিধ বিষয় কার্য্যের আলোচনা করিতে হইত। আর সত্য কথা বলিতে কি—সোণাকে তখন আমার ভালও লাগিত না, ভ্রমর এক ফুলের মধু পান করিয়া কতক্ষণ তৃপ্ত থাকে? সোণার ইহাতে কষ্ট হইতে লাগিল, এই কষ্ট শেষে সন্দেহে পরিণত হইল।

এক সময়ে তিনদিন ধরিয়া সোণার সহিত সাক্ষাতের অবসর পাই নাই, চতুর্থ রাত্রিতে বাহির হইব মনে করিতেছি, অমনি প্রবল ঝড়ের সহিত মুষল ধারায় বৃষ্টি নামিল। বিষণ্ণ মনে আপনার ঘরে বসিয়া আছি, এমন সময়ে সহসা সোণাকে সঙ্গে লইয়া রমা আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল—"পুলিন-দা' দেখ—তোমার কাছে কে আসিয়াছেন!"

সোণাকে তথায় দেখিয়া আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। ভাগ্যক্রমে রমা আর সেখানে দাঁড়াইল না, এক অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া তৎক্ষণাৎ সেস্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু রমা শুনিতে পায়—এরূপ ভাবে আমি সোণাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি এ সময়ে এখানে কি জন্য আসিয়াছেন? আপনার স্বামীর অসুখ বাড়ে নাই ত?"

সোণা অবাক্ হইয়া আমার দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিতে লাগিল, পরে নিম্নস্বরে তাহাকে বলিলাম -"আমার মাথা খাইতে এখানে কেন আসিয়াছ?"

সোণা প্রায় কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল যে, সে আমাকে না দেখিয়া আর থাকিতে পারিতেছে না।

আমি বলিলাম—"এ বাড়ীর কেহ জানিতে পারিলে সর্ব্বনাশ হইবে।"

সোণা বলিল—"একলা থাকিতে আমার যে বড় কষ্ট হয়, কবে আমাদের বিবাহ হইবে—কবে আমাকে এখানে আনিবে?"

আমি বলিলাম—"একি আমার নিজের বাড়ী সোণা,—যে আমার ইচ্ছামত কার্য্য হইবে?"

সোণা বলিল—"কেন, ধরণীবাবু তোমার পিতা নহেন?"

আমি বলিলাম—"না, মাত্র প্রতিপালক—আশ্রয়দাতা।"

সোণা চমকিয়া উঠিল, বলিল—"আমি ত তাহা জানিতাম না।"

আমি বলিলাম—"তিনি আমায় পিতার মতই স্নেহ করেন এবং আমিও তাঁহাকে সন্তানের মত ভক্তি করি—সেই জন্যই তোমার নিকট সে কথা বলি নাই।"

যাহা হউক, সেখানে বসিয়া অধিক কথা বলা চলে না, কাজেই যে ট্যাক্সিতে সোণা আসিয়াছিল তাহাতেই আবার তাহাকে লইয়া বৌবাজারের বাসায় চলিয়া গেলাম। গাড়ীতে বসিয়া সোণা আমায় জিজ্ঞাসা করিল—"রমা তবে তোমার সহোদরা নয়?"

আমি বলিলাম—"না হইলেও, রমাকে চিরদিনই আমি সহোদরার মত দেখিয়া আসিতেছি।"

সোণার সন্দেহ ইহাতে তিরোহিত হইল কিনা জানিনা, কিন্তু পরদিন হইতে প্রত্যহই আমাকে তাড়াতাড়ি বিবাহটা সারিয়া ফেলিবার জন্য তাগাদা করিত, আমিও নানা ওজরে বিলম্বের কথা জানাইতাম।

আমার মন যোগান ব্যবহারে ধরনীবাবুর মনটা অল্পেই আমার আয়ত্ত্বে আসিয়াছিল, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া দিন দিন আমার উপর সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করিতে লাগিলেন। ক্রমে আমি তাঁহার যাবতীয় আয় ব্যয়ের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক হইয়া উঠিলাম। তাঁহার

বিষয় বিভব সমস্তই যেন আমার নিজের—তিনি মাত্র উপদেশ-দাতা। কিন্তু এত দিনেও রমার চরিত্রের স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারিলাম না! আমার যত্ন লইবার কোন ব্যবস্থারই তাহার ত্রুটী নাই,—কিন্তু আমার সঙ্গে মিলিতে মিশিতে সে যেন ভালবাসে না। ইহা যে তাহার নারীসুলভ সলজ্জ স্বভাব—তাহাও নহে। অথচ—এই রমা আমায় ভাল না বাসিলে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, রমা আমার না হইলে আমি এ বাড়ীর কে—এখানে আমার সম্বন্ধ কি? অন্য কেহ আসিয়া—আমাকে মধুচক্র হইতে মক্ষিকার মত তাড়াইয়া—রমাকে লইয়া ধরণীবাবুর এই বিষয় সম্পদের অধিকারী হইয়া বসিবে—আমি তাহা দেখিতে পারিব না; আমার আশার গ্রাস অন্যে কাড়িয়া লইবে—আমার তাহা সহ্য হইবে না। যে কোন প্রকারে হউক—রমাকে হস্তগত না করিলে উপায় নাই।

ভাবিলাম—স্বত্বরই ইহার একটা শেষ বুঝিয়া লইব। সেদিনের বালিকা রমা—আমায় আর কত ফাঁকি দিবে?

বেশী রাগ পড়িল—রমার সেই দ্বিপ্রহরের সখী-সভার উপর। উহা বন্ধ করিতে হইবে ভাবিয়া ধরণীবাবুকে একদিন গোপনে উহার দোষের দিকটা ভালরূপ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইলাম, তিনি আমার সুবুদ্ধির প্রশংসা করিলেন। ফলে, দেখিলাম—একদিন খিড়কীর দরজায় রমা নিজেই তালা লাগাইল। ইহার অর্থ

বুঝিতে আমার বাকী রহিল না, রমা নিশ্চয়ই জব্দ হইয়াছে ভাবিয়া একটু ফূর্ত্তি অনুভব করিলাম।

একদিন সন্ধ্যার সময় সোণার বাসায় গিয়া নানারূপ প্রবোধ বাক্যে তাহাকে বুঝাইয়া শান্ত করিয়া বাটী ফিরিতে অনেক রাত্রি হইল। ধরণীবাবু ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, রমা তখনও বসিয়া কি একখানি বই পড়িতেছিল। আমি তখন মদের নেশায় ভরপুর—আহারে রুচি ছিল না—রমাকে তদবস্থায় দেখিয়াও কিছু না বলিয়া নিজের শয়ন-গৃহে চলিয়া গেলাম। কিছুক্ষণ পরে রমা আমার গৃহদ্বারে আসিয়া ডাকিল—"খাইবে এস—পুলিন-দা'।"

আমি চেষ্টা করিয়া স্বাভাবিক স্বরে বলিলাম—"না, আমি খাইয়া আসিয়াছি, তুমি অকারণ কষ্ট করিয়া জাগিয়া আছ—রমা।"

রমা ফিরিয়া যাইতেছিল, আমি ডাকিলাম—"যেও না রমা, ব'স—একটা কথা আছে।"

রমা গৃহ প্রবেশ করিয়া চেয়ারে বসিল, আমিও তাহার প্রায় নিকটে শয্যার উপরে বসিয়াছিলাম। এইবার যেমন ডাকিয়াছি—"রমা—"

অমনি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া সে বলিয়া উঠিল—"পুলিন-দা', তুমি মদ খাও!"

গন্ধটা যে রমা পাইবে—তাহা আমার অজানা ছিল না, সুতরাং মাত্র একটু হাসিলাম। পরে আবার বলিলাম—"আমায় ঘৃণা করিলে রমা ?"

রমা সে কথার কোন উত্তর না দিয়া আবার প্রশ্ন করিল—"কতদিন এ অভ্যাস হইয়াছে তোমার ?"

আমি বলিলাম—"যতদিন হইতে তোমার অনাদরে জর্জ্জরিত হইতেছি।"

রমা প্রস্থান করিতেছিল, আমি আবার ডাকিয়া ফিরাইলাম। সে জিজ্ঞাসা করিল—"ইহার পরিণাম জানা আছে?"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"খুব জানি,—মনুষ্যত্ব হারাইয়া পশুত্ব লাভ।"

"তবে ?"

"কিন্তু, আমার এই অধঃপতনের জন্য কে দায়ী, জান রমা ?"

রমা সহজেই বলিল—"তুমি নিজে।"

আমি বলিলাম—"না—রমা, এক মাত্র—তুমি।"

একটু ঔদাস্যের হাসিতে রমা বলিল—"আমি! কিসে?"

"নও কিসে? তুমি ত আর একেবারে বালিকা নও যে কিছু বুঝিতে পার না ?"

"তোমার উদ্দেশ্য কি পুলিন-দা' ?"

"তোমার একটু ভালবাসা।"

"কোন দিন কি তোমায় ঘৃণা করিয়াছি?"

"বাহ্যিক না হইলেও, অন্তরে—বোধ হয়—ঘৃণাই কর। নতুবা আমায় এমন পাগল করিয়া তোমার ত কোন লাভ দেখিতে পাই না।"

"এসব—কি কথা পুলিন-দা' আমি তোমায় পাগল করিলাম।"

"তোমায় না পাইলে আমি নিশ্চয়ই পাগল হইব; তুমি কি আমার জীবন-সঙ্গিনী হইবে না?"

রমা নিষ্ঠুর ভাবে বলিল—"আমার জীবনের কোন সঙ্গীর প্রয়োজন নাই।"

আমি বলিলাম—"কিন্তু অবিবাহিতা ত থাকিবে না।"

"হাঁ—তাহাই থাকিব, আজীবন কুমারী থাকিলে লোকে নিন্দা করিবে—করুক, তবুও স্বামীরূপে এমন মাতালের সেবা করিতে পারিব না।"

আমি বলিলাম—"সকলেই ত' আমার মত মাতাল নয়, কত লোক আছে—যাহারা তোমার একটু সেবা করিতে পারিলে জীবন ধন্য মনে করিবে।"

সে বলিল—"তেমন গোলামের আমার আবশ্যক নাই।"

আমিও তখন উত্তেজিত হইয়াছিলাম, কিন্তু সামলাইয়া বলিলাম—"গোলাম না হউক—প্রভুর প্রয়োজন ত হইতে পারে?"

হঠাৎ হাসিয়া রমা বলিল—"সেদিন আর এখন নাই পুলিন দা',—'পতি পরম গুরু'—এ সকল বইএর কথা—গল্পের কথা; কৈ—প্রভু ত একটীও দেখিতে পাই না—সবই গোলামের দল, এখন পত্নীই পরমাগতি! যাউক সে কথা; আচ্ছা,—পুলিন-দা'! সেদিনের সেই মেয়েটী কে?"

আমি বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কোন্ মেয়েটী?"

"যাহার নাম সোণা,—মনে নাই?"

আমি একটু চিন্তিতের ভাণে বলিলাম—"ও,—হঁ্যা, বাড়ী তাহার বম্বে; সেদিন রাস্তায় তাহার স্বামী গাড়ী চাপা পড়ায় আমি বাড়ী পৌছাইয়া দিয়াছিলাম, সেই সূত্রে আলাপ।"

রমা বলিল—"পুলিন-দা', মিথ্যা বলিও না।"

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম—"সে কি! সেই যে মোটর চাপা পড়ার সংবাদ কাগজে বাহির হইয়াছিল—তুমি পড় নাই? ঠিক আমার সম্মুখেই চাপা পড়িয়া বেচারির পায়ের হাড়খানা পটাশ্ শব্দে ভাঙ্গিয়া গেল, উঃ—সে কি কষ্ট!"

রমা হাসি চাপিয়া ব্যঙ্গভাবে বলিল—"কৈ পুলিন-দা', তোমার ত কোন পা ভাঙ্গে নাই?"

আমি বলিলাম—"আমার ভাঙ্গিবে কেন? সেই স্ত্রীলোকটীর স্বামীর।"

"তবে—তুমি তাহার—কে?" দৃঢ় স্বরে রমা এই কথা বলিয়া

—একবার নির্ম্মম দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া—আমার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া প্রস্থান করিল।

আমার সন্দেহ হইল—তবে ত রমা সব জানিয়াছে, ভয় হইল—হয়ত এত চেষ্টা ব্যর্থ হয়—সকলই বুঝি বা হারাইতে হয়! ভাবিয়া দেখিলাম—সহজে কার্য্য হইবে না। কিন্তু যাহা যত দুর্লভ, তাহা লাভের জন্য আগ্রহ ততই প্রবল হয়। যত বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হউক, আমি নিরাশ হইবার পাত্র নহি। মনে মনে বলিলাম—কিন্তু তোমার ইচ্ছা অনিচ্ছায় কিছু আসিবে যাইবে না রমা, বিবাহ তোমায় করিবই, পার—বাধা দিও।

পূজার ছুটীর দুই এক দিন পূর্ব্বে ধরণীবাবুকে জানাইলাম—আমার এখন পৃথক বাসের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ধরণীবাবু অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে কি! একথা কেন পুলিন?"

এ কথার অর্থটা আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলাম—ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই; মনুষ্য সমাজে বাস করিতে হইলে অর্থ যেমন প্রয়োজন, সামাজিক রীতি নীতি—অবশ্য যে গুলি সর্ব্বসম্মত হিতকরী—সুযশ কুযশ প্রভৃতির প্রতিও তেমনি সমান দৃষ্টি না রাখিলে চলে না। স্নেহ পরায়ণ হইয়া এক্ষেত্রে পক্ষপাতী হইলে চলিবে না। রমার এখনও

বিবাহ হয় নাই, আমিও অবিবাহিত, এ অবস্থায় সমাজের কুদৃষ্টি এদিকে পড়িবার পূর্ব্বে আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত।

ধরণীবাবু হাসিয়া উঠিলেন। আমি বলিলাম—"কথাটা কি সত্য নয়?"

তিনি বলিলেন—"খুব সত্য, তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, যথার্থ অনুমান করিয়াছ। কিন্তু এ ত সেরূপ ক্ষেত্র নয়, ইহাতে দোষের কিছু নাই। শোন পুলিন! দুঃখের বিষয়—আজ রমার গর্ভধারিণী জীবিতা নাই। তাঁহার বড় সাধ ছিল—তোমার সঙ্গে রমার বিবাহ দিবেন। তাঁহার সেই ইচ্ছা আমাকেই পূরণ করিতে হইবে। আগামী শীতের প্রারম্ভে শুভদিন দেখিয়া তোমাদের দুইটী হাত এক করিয়া দিতে পারিলেই আমার প্রধান কর্ত্তব্য শেষ হয়। কেন পুলিন—এ বিবাহে তোমার কি কোন অমত আছে?"

আমি বলিলাম—"আমার মতামতের কোন মূল্য নাই, চিরজীবন আপনার চরণে কৃতজ্ঞতায় আমি আবদ্ধ, নিজে কোন স্বাধীন অভিপ্রায় আজ পর্য্যন্ত পোষণ করি নাই।"

ধরণীবাবু বলিলেন—"তবে আর কি, তুমি নিঃসঙ্কোচে এখানে বাস কর।"

আমি বলিলাম—"কিন্তু রমার মতামতও আপনার একবার

জিজ্ঞাসা করা উচিত। এখন সে-ও নিজের ভালমন্দ বুঝিতে পারে।"

ধরণীবাবু আবার হাসিয়া বলিলেন—"আমরা সে কালের লোক, কন্যার মতামত জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার বিবাহ দিব—এতদূর সুসভ্য এখনও হইয়া উঠিতে পারি নাই। সেদিনকার বালিকা রমা—তাহার নিজের ভবিষ্যৎ ভালমন্দ আমার অপেক্ষা অধিক বুঝিবে না। আর মাতাপিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধ মত করিবে—রমা ত আমার এমন মেয়ে নয়, তাহার জননীর অন্তিম অনুরোধ সে ত স্বকর্ণে শুনিয়াছে!"

আনন্দে আমার বক্ষ স্ফীত হইল, মনে মনে কহিলাম—কেমন, দেখিলে রমা—জয়ী কে?

* * * *

(১২)

বিবাহের কথা লইয়া সোণা তখন বড়ই ঘ্যান্ ঘ্যান্ আরম্ভ করিয়াছিল,—সে কাঁদিয়া দিন কাটাইত। আমি তাহাকে প্রকৃতই বিবাহ করিব কি না—কেবল স্তোক বাক্যে ভুলাইয়া রাখিতেছিলাম কি না—প্রত্যহই সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত; আমার ব্যবহারে তাহার ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু উপায় নাই, আমি তখন পরিত্যাগ করিলে সোণার বিপদের সীমা থাকে না, আমাকে বিবাহ করা ভিন্ন তাহার আর গত্যন্তর ছিল না—অভাগিনী তখন সন্তান-সম্ভবা।

একদিন সোণা আমায় ভয় দেখাইল—"নারীর সর্ব্বস্ব লইয়া এই বিপদের অবস্থায় এখন যদি তাহাকে পরিত্যাগ কর, কিছুতেই তুমি সুখী হইতে পারিবে না, মাথার উপর ভগবান্ আছেন।"

সোণার রাগ দেখিয়া আমার হাসি পাইল। সোণা আবার বলিল—"আমার ভয় হয়—বুঝি প্রতারিত হইব, নতুবা আজকাল করিয়া এখনও তুমি আমায় বিবাহ করিয়া এই বিপদ হইতে মুক্ত করিতেছ না কেন?"

আমি সোণার দিকে চাহিলাম—রাগে চক্ষু আমার

জ্বলিতেছিল, তথাপি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমার এই মিথ্যা সন্দেহ যদি সত্যই হয়—কি করিবে তুমি ?"

সোণা বলিল—"কি করিব ? কেন—রমাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিব।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কাহাকে বলিবে ?"

সোণা বলিল—"তোমার ভগ্নী—রমাকে।"

"রমাকে তুমি ইহার মধ্যে চিনিয়া ফেলিয়াছ ?"

"চিনিয়াছি ; সে স্ত্রীলোক—নিশ্চয়ই আমার মনের ব্যথা বুঝিয়া প্রতিকার করিবে।"

রাগে আমার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু আত্ম সম্বরণ করিয়া উচ্চহাস্যে সোণাকে বলিলাম—"পাগল আর কি ! রমা তোমার বিবাহ দিবে ? সে ধাতের মেয়ে সে নয়, নিজে বিবাহ করিবে না, বিবাহের সে পক্ষপাতী নয়। তুমি ভাবিও না সোণা, শীঘ্রই তোমায় বিবাহ করিতেছি, আর্য্যসমাজের সভাপতির সহিত শীঘ্রই আমি সাক্ষাৎ করিয়া এ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।"

সোণার সরল প্রাণ এ কথায় আশ্বস্ত হইল, ক্ষণিকের ক্রোধ অভিমান ভুলিয়া আবার তাহার সুন্দর মুখে হাসি ফুটিল।

কার্ত্তিক মাসের শেষ হইতে ধরণীবাবু রমার বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন। আমি যাহা আশা করিয়াছিলাম—তাহাই হইয়াছে। রমা তাহার মায়ের শেষ অনুরোধের বিরুদ্ধে

মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিয়া ধরণীবাবুর কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে পারে নাই ; সে আরও গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছিল—আমার দিকে তখন আর ফিরিয়া চাহিত না, কথা বলাও প্রায় বন্ধ করিয়াছিল; তাহার ভাব দেখিয়া চুপ করিয়া রহিলাম, বুঝিলাম —সে আমায় ঘৃণা করে। আমার তাহাতে বিশেষ ক্ষতি নাই।

কিন্তু ভয় হইল—সোণাকে। সত্যই সে অল্পে ছাড়িবে না, ছাড়িলে তাহার দাঁড়াইবার স্থান থাকে না। হয়ত আমার খোঁজে আবার একদিন এই বাড়ীতে হাজির হইবে, পূর্ব্বে ঘুণাক্ষরে জানিতে পারিলে কিছুতেই সে এ বিবাহ হইতে দিবে না। এখন তাহাকে স্থানান্তর না করিলে উপায় নাই।

সেদিন রবিবারে সোণার ইচ্ছা হইল - বেড়াইতে যাইবে ; আমিও প্রস্তুত ছিলাম। তাহাকে আমি বিবাহ করিব না—একথা সোণা নিশ্চয় জানে না। সন্দেহে দুলিয়া যতই অধীর হইয়া উঠিতেছিল—আমি ততই তাহাকে অধিকতর আদর দেখাইতে ছিলাম।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"কোথায় বেড়াইতে যাইবে ?"

সোণা বলিল—সহরের সবই সে দেখিয়াছে, কোথাও তাহার আর ভাল লাগে না। আমি বলিলাম—"গঙ্গার ধারে ?"

সোণা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল—"বঙ্গের সমুদ্র তীরের তুলনায় কিছুই নয় !"

আমি বলিলাম—"আচ্ছা চল, আমাদের দেশের এক নূতন দৃশ্য তোমায় দেখাইয়া আনি, এ সম্পদ বাঙ্গলায় যেমন আছে, তেমন আর অন্য কোথাও নাই।"

সোণা জিজ্ঞাসা করিল—"কি—সে?"

আমি বলিলাম—"যে জন্য বাঙ্গলাকে সোণার বাঙ্গলা বলে—বাঙ্গলার সেই 'সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা' পল্লী সৌন্দর্য্য!"

সোণা আনন্দের সহিত আমার সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িল। ষ্টেশন সংলগ্ন হোটেল হইতে এক ফ্লাস্ক্ ব্রাণ্ডি পকেটস্থ করিয়া সোণাকে লইয়া কোন ট্রেনে উঠিলাম, ট্রেন কলিকাতা ছাড়িয়া চলিল।

অনন্ত হরিৎ ক্ষেত্রের মধ্যদিয়া হু হু শব্দে গাড়ী ছুটিয়া চলিয়াছে; রৌদ্রের তেজ নাই, প্রথম শীতের স্নিগ্ধ বাতাসে সোণার প্রাণটী প্রফুল্ল হইল। প্রান্তরের পর প্রান্তর চলিয়াছে—সমতল—উর্ব্বর, স্থানে স্থানে শত শত গাছের সারি—সৈন্য সারির মত মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে; কখনও বা প্রান্তর শেষ হইয়া বহুবিধ ফল-পুষ্প-সমন্বিত এক এক খানি পল্লীচিত্রে সোণা উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছে! "এটা কি গাছ," "ওটাকে কি বলে," "উহার নাম কি পাখী"—এইরূপ নানাবিধ প্রশ্ন করিতেছে। বেলা যখন প্রায় শেষ হইল, আমরা কোন ষ্টেশনে নামিলাম। আজিকার দিনটী সোণার বেশ হাসি ও আনন্দে

ক াটিতেছিল। আমি বলিলাম—"এখান হইতে বেড়াইতে বেড়াইতে পরবর্ত্তী তিন চারি মাইল দূরের ষ্টেশনে গিয়া ট্রেনে উঠিয়া কলিকাতায় ফিরিব।"

সোণা আনন্দে সম্মত হইল।

রাস্তা ছাড়িয়া আমরা প্রান্তরে ও বনপথে চলিয়াছি, হৈমন্তিক শস্যের ফুলে ফুলে ছাইয়া গিয়া মাঠের তখন অতুল শোভা! অস্তমান সূর্য্যের রক্ত গোলকটী আকাশের গায়ে নানা রংএর ঢেউ ছড়াইয়া দিগন্তের কোলে—দূরের ধূ ধূ গাছের সারি মধ্যে ধীরে ধীরে ডুবিয়া যাইতেছে! আমরা উভয়ে উভয়ের বাহু বেষ্টনে সেই মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে নির্জ্জন পথে চলিয়াছি, সোণাকে আনন্দ দানের জন্য মধ্যে মধ্যে আমি শীষ্ দিতেছি, আমার অনুরোধে সোণাও একস্থানে বসিয়া একবার গলা ছাড়িয়া সুমিষ্ট তানে আপনার গোপন দুঃখ কথা দিনপতির চরণে নিবেদন করিল, প্রতিধ্বনি কাঁদিয়া উঠিল, দিননাথ অস্তাচলে মুখ লুকাইলেন, সেই নির্জ্জন প্রান্তরে ক্ষণিকের জন্য মুগ্ধ হইলাম—শুধু আমি।

রাখালেরা এই সময়ে গরুর পাল লইয়া আপন আপন গৃহে ফিরিতেছিল, পথের মাঝখানে আমাকে সাহেবী সাজে এবং আমার সঙ্গিনীকে পারসী পোষাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া কেহ কেহ—কি জানি কি মনে করিয়া—সেলাম দিয়া চলিয়া গেল।

প্রেম-না-প্রবঞ্চনা।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, আমরাও মাঠ ছাড়িয়া রেল রাস্তার উপরে উঠিলাম। অনেকক্ষণ চলিবার পর বহুদূরের লাল নীল আলোক লক্ষ্য করিয়া বুঝিলাম—আর মাইলখানেক গেলেই গন্তব্য ষ্টেশনে পৌঁছিতে পারিব। কিন্তু সোণা আর চলিতে পারিতেছিল না, তাহার অত্যন্ত পরিশ্রম হইয়াছিল, কিছুক্ষণ বিশ্রামের জন্য সে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। উচ্চ রেল পথের একটা ছোট পুলের খিলানের গাঁথনির উপর সোণাকে লইয়া বসিলাম।

আকাশের পাতলা মেঘের অন্তরাল হইতে তখন জ্যোৎস্না-রশ্মি ফুটিয়া বাহির হইতেছিল, সোণা অর্দ্ধশয়নাবস্থায় আমার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া চন্দ্র ও মেঘের সেই লুকোচুরি খেলা দেখিতেছিল। আমি দেখিতেছিলাম—সোণাকে, আর মনে জাগিতেছিল—সেই পূর্ব্ব ভাবনা—কিরূপে সোণার হাতে অব্যাহতি পাই। পকেট হইতে ফ্লাস্ক্ বাহির করিয়া খানিকটা তীব্র ব্রাণ্ডি পান করিলাম, তারপর ধীরে ধীরে বলিলাম—"সোণা! আমায় কি তুমি ভুলিতে পার না?"

সোণা সহসা এ কথায় চমকিত হইল। কিছুকাল একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া, আমার ক্রোড় হইতে ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল—"আজ এ কি কথা! আমায় কি তুমি ভালবাস না?"

আবার স্নেহের ভাণে তাহাকে ভুলাইবার জন্য বলিলাম—"তোমায় খুব ভালবাসি, সে সন্দেহ তুমি করিও না সোণা।"

সে প্রায় কাঁদিয়া বলিল—"তবে এমন কথা বলিলে কেন?"

আমি স্পষ্ট বলিলাম—"তোমায় আমায় বিবাহ—বুঝি বিধাতার অভিপ্রেত নয়।"

সোণা কাঁদিতে লাগিল।

আবার সেই কান্না—আমার যাহা ভাল লাগে না!—যে জন্য সোণার সংসর্গ তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল! সোণা এখন আমার বিপজ্জনক গলগ্রহ, আমার অভীষ্ট সিদ্ধির প্রধান অন্তরায়! সে আমায় ভালবাসে,—তাহাতে কি আসে যায়? একটা রাস্তার ভিখারিণী যদি আমায় ভালবাসে—আমি কি তাহার প্রেমে ভিখারী সাজিতে পারি?

সোণা বলিতে লাগিল—"দেখ নিষ্ঠুর হইও না, আপনার প্রতিজ্ঞা ভুলিও না, আমাকে পরিত্যাগ করিও না; বিবাহ করিবার প্রলোভনে ফেলিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছ, আমার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছ, এখন এই লজ্জাকর বিপদের অবস্থায় যদি আমায় ত্যাগ কর,—অপমানের হাত এড়াইতে মৃত্যু ভিন্ন আমার উপায় থাকিবে না।"

'মৃত্যু!'—সোণার মুখের এই মৃত্যু কথাটায় আমার চিন্তার গতি ফিরাইয়া দিল, সোণার হাত হইতে উদ্ধারের পথ খুঁজিয়া

পাইলাম, ভাবিলাম—তাহাই বটে, মরণেই এখন সোণার মঙ্গল; মরিবে ত সকলেই, তবে—কিছু পূর্ব্বে হইলে ক্ষতি কি? ইহাতে সোণারও সম্মান রক্ষা হইবে, আর—আমারও পথ মুক্ত হইবে।

সোণা কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার কোমল বাহু দু'খানিতে আমার কণ্ঠদেশ জড়াইয়া ধরিয়া, ছল ছল চক্ষু দু'টী আমার চক্ষের উপর স্থাপন করিয়া বলিল—"সত্যই কি তুমি আমায় ত্যাগ করিবে—আর কি তুমি আমায় ভালবাস না?"

আমিও আমার দৃঢ় ও সবল উভয় করাঙ্গুলে তাহার ক্ষীণ ও কোমল কণ্ঠখানি বেষ্টন করিয়া—তাহার রক্তিম অধরে শেষ চুম্বন লইয়া কৃত্রিম স্নেহে বলিলাম—"বাসি—এখনও তোমায় আমি পূর্ব্বের মতই ভালবাসি—সোণা!"

তাহার পর যাহা করিলাম—বিশ্বের লোক শুনিয়া চমকিত হইবে, ধৈর্য্য হারাইবে, মূর্ত্তিমান সয়তান ভাবিয়া আমার নামে লোকে শিহরিয়া উঠিবে। কিন্তু তবুও আমায় বলিতে হইবে, কেননা—আমি বলিতে বসিয়াছি।

সোণা ভাবিয়াছিল যে, প্রণয়ের আবেগে আমি তাহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়াছি, আমি যে রাক্ষস—তাহা ত সে জানিত না, সরল প্রাণে আমায় বিশ্বাস করিয়াছিল! কিন্তু আমার সবল করাঙ্গুলে তাহার সেই কণ্ঠবেষ্টন ক্রমশঃ দৃঢ় হইয়া—কোমল কণ্ঠনলিটী চাপিয়া পিষিয়া একেবারে চিরদিনের মত রুদ্ধ করিয়া দিল!

মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে সে বুঝি আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া একবার ধড়ফড় করিয়া উঠিল, কাতর নয়নে বোধ হয় আমার দিকে শেষ চাহনি চাহিল, আমি তাহা দেখিয়াও দেখিলাম না। নাক মুখ হইতে তাহার গল্ গল্ ধারে রক্ত ঝরিতে লাগিল, মুখবিবর হইতে জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িল, প্রাণপাখী সোণার পিঞ্জর ছাড়িয়া পলাইল।

মৃতদেহ মৃত্তিকার উপর ফেলিয়া কিছুকাল তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। আমারও যেন তখন চৈতন্য ছিলনা, কি একটা দানবীয় আচ্ছন্নতায় আপনার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়া ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িলাম।

একটা ঘাম হইয়া পুনর্ব্বার প্রকৃতিস্থ হইলাম। হঠাৎ মনে পড়িল—সোণার বক্ষঃস্থ সরু স্বর্ণহারের লকেটে আমারই একটি ক্ষুদ্র আলোক-ছবি রহিয়াছে; অবিলম্বে উঠিয়া ক্ষিপ্রহস্তে সেই স্বর্ণহার, আমারই প্রদত্ত একটী আংটী ও আর যাহা সামান্য অলঙ্কার ছিল এবং কটিবন্ধ হইতে আমারই নামাঙ্কিত রুমালখানি —সমস্তই খুলিয়া লইয়া আপনার পকেটে পুরিলাম। সনাক্ত করিবার কোন উপায় না থাকে তৎপক্ষে ভালরূপ ব্যবস্থা ও পরীক্ষা করিয়া ষ্টেশনে যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলাম। আবার ভাবিলাম—না, মৃতদেহ এই উন্মুক্তস্থানে ফেলিয়া গেলে লোকচক্ষু সহসা ইহার উপর পড়িবে। পুল হইতে কয়েক হাত দূরে

রেলরাস্তার পার্শ্বে একটা ঘন উলুবন ছিল, সেইখানে লাস গোপন করিবার অভিপ্রায়ে অতি কষ্টে তাহা টানিয়া লইয়া সেই উচ্চ রেলরাস্তা হইতে নিম্নে উলুবন মধ্যে ফেলিয়া দিলাম। পতনের শব্দ হইল, উলুবন নড়িয়া উঠিল, কিন্তু কি আশ্চর্য্য—সেই ঘন বনমধ্য হইতে এক জীবিত স্ত্রীমূর্ত্তি ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল!

ভাবিলাম—কে—এ? সোণা কি মরে নাই? আবার ভাবিলাম—নিশ্চয়ই সে মরিয়াছে—আমি ভালরূপ পরীক্ষা করিয়াছি; তবে এ কি সোণার প্রেতাত্মা! বাল্যকালে পিসীর মুখে ভূতের গল্প শুনিয়াছি, বিলাতেও কেহ কেহ ভূতের ভয় করেন, আমি এতদিন বিশ্বাস করি নাই—আজ বিশ্বাস করিলাম, আতঙ্কে বুক কাঁপিয়া উঠিল, প্রাণপণে ষ্টেশনের দিকে দৌড়াইলাম; কিন্তু পা যেন চলে না, মনে হইতে লাগিল—সোণার সেই প্রেতাত্মা যেন আমায় ধরিবার জন্য আমার পশ্চাতে ছুটিয়া আসিতেছে, অতিকষ্টে যখন ষ্টেশনের সীমানার মধ্যে আসিয়াছি, ভয় হইল—সোনার হাত দুইটা যেন দশহাত লম্বা হইয়া আমার গলা টিপিয়া ধরিতে আসিতেছে, সাধ্যমত আরও দ্রুত দৌড়াইয়া একেবারে প্ল্যাটফরমে উঠিলাম।

বিশ্রামকক্ষে উপবেশন করিয়া প্রথমেই পকেট হইতে ফ্লাস্ক্ বাহির করিয়া অবশিষ্ট মদটুকু এক নিশ্বাসে নিঃশেষ করিলাম।

কতকটা সুস্থ হইয়া—কর্ত্তব্য কি, সোণার বাসার দাসদাসীকে কি বলিব—এইরূপ নানা কথা ভাবিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে কলিকাতাগামী গাড়ী আসিল; টিকিট আর করিতে হইল না—ফিরিবার টিকিট পূর্ব্বেই সংগ্রহ ছিল, আস্তে আস্তে বাহির হইয়া ট্রেণের এক দ্বিতীয় শ্রেণীর নির্জ্জন কক্ষে উঠিয়া বসিলাম।

গাড়ী ছাড়িবে এমন সময়ে একটী স্ত্রীলোক তাড়াতাড়ি আসিয়া আমার সেই গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। আমি অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া চুরুট টানিতেছিলাম, যেই মাত্র তাহার দিকে চাহিয়াছি—আবার আমার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, অবাক হইলাম—একি, এ যে—সোণা!

সে-ও আমায় স্থিরদৃষ্টিতে দেখিতেছিল, গাড়ীর বিদ্যুৎ আলোক তাহার মুখে পড়িয়াছিল, ভালরূপ লক্ষ্য করিলাম—না সোণা নয়, এমন মূল্যবান অলঙ্কার সোণা কোথায় পাইবে? আর, বয়সেও সোণার অপেক্ষা অনেক বড়, কিন্তু হঠাৎ দেখিয়া ধরিতে পারা যায় না, অবিকল সোণারই মত।

রমণী নব-যৌবনা না হইলেও গত-যৌবনা নহে!

হাসিয়া প্রশ্ন করিল—"আপনিও কি কলিকাতায় যাইবেন?"

বাঃ! কণ্ঠস্বরও যে ঠিক সোণারই মত!

অবিলম্বে তাহার সহিত বাক্যালাপ আরম্ভ করিলাম, বেশ শিক্ষিতা, রসিকা, বে-পর্দ্দা মহিলা! আমাদের আলাপ ক্রমে জমিয়া উঠিল।

হঠাৎ এক চমৎকার সাফাই মতলব আমার মাথায় আসিল; —যদি ইহাকে কোন গতিকে আজ রাত্রির মত বৌবাজারে সোণার বাসায় লইয়া যাইতে পারি—আমার বিপদের ভয় কাটিয়া যাইবে, সোণা ফিরিয়াছে ভাবিয়া কেহ কোন সন্দেহ করিবে না। তারপর ইহাকে বিদায় করিয়া দিলেই সকল গোল মিটিয়া যাইবে।

সুরসিক ও সুচতুরের অহঙ্কার আমারও কম ছিলনা, নানারূপ হাসি, গল্প ও আলাপে অল্পক্ষণ মধ্যেই আমি তাহার প্রায় আপনার লোক—অন্তরঙ্গ বন্ধু হইয়া উঠিলাম; মনোরথ সিদ্ধ হইল, বুঝিলাম—সে আমায় পছন্দ করিয়াছে।

গাড়ী এতক্ষণ চলিতেছিল কি দাঁড়াইয়া ছিল—আমাদের উভয়ের সেদিকে হুঁস্ ছিল না, কলিকাতায় আসিয়া থামিতে আমাদের চমক ভাঙ্গিল। আপন সৌভাগ্যে গর্ব্বিত ও উৎফুল্ল আমি—সোণার বদলে হীরার হাত হাতে লইয়া—ষ্টেশনের বাহিরে মোটরে উঠিয়া বৌবাজারের বাসার দিকে রওনা হইলাম।

• • • • •

হীরা-বাঈজীর কথা।

(১৩)

কিশোরীলালের মৃত্যুর পর আমিও পায়ের জীর্ণ শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া বাঈজী হইলাম। আমার সঙ্গীতের সুযশে আজ ভারত ব্যাপ্ত, পল্লীগ্রামের রসিক তাঁতির ঘরণী সেই হিরণ আমি—আজ কত রাজা মহারাজা আমার প্রেমের ভিখারী—আজ্ঞাবাহী! কোন অভাব নাই, কিন্তু সুখও খুঁজিয়া পাই না; কি যে দুঃখ—কেন যে দুঃখ—তাহাও ঠিক বুঝিনা। হৃদয়ের কোথায় একটা বেদনা জাগিয়া উঠিল,—ক্ষুদ্র পরেশ আমায় ঘৃণা করে, তাহার সেই অহঙ্কার চূর্ণ করিতে পারিলাম না, এ পরাজয় অপেক্ষা মৃত্যুও আমার ভাল ছিল। চলন্ত রেলগাড়ী হইতে পড়িয়া কেহ কোথাও বাঁচিয়াছে—কই, শুনি নাই ত! তবে আমি কেন মরিলাম না!

গাড়ী হইতে পড়িয়া গিয়া ঘুরপাক খাইবার সঙ্গে সঙ্গে অচৈতন্য হইলাম। অজ্ঞান অবস্থায় কতক্ষণ ছিলাম বলিতে পারি না, তবে খুব বেশীক্ষণ যে নয়—তাহা ঠিক। চক্ষু মেলিয়া

দেখিলাম—স্ফটিক জ্যোৎস্নায় দিগন্ত হাসাইয়া আকাশে শশাঙ্ক হাসিতেছে! কোথায় আছি, সত্যই জীবিত আছি—না মরিয়া সৃষ্টির কোন নূতন সীমান্তে আসিয়া পড়িয়াছি—প্রথমে স্থির করিতে পারি নাই। ক্রমে ক্রমে পূর্ব্ব ঘটনা সমুদয় স্মরণ হইতে লাগিল।

দেখিলাম—রেলরাস্তার পার্শ্বস্থ এক ঘন উলুবন মধ্যে আমি পড়িয়া রহিয়াছি; ধীরে ধীরে উঠিবার চেষ্টা করিয়া বুঝিলাম—কোথাও কোন আঘাত বা বেদনা নাই, অনেকটা স্বাভাবিক অবস্থাতেই আছি! কোন্ বিধাতার ক্রীড়া রহস্যে এইরূপ মৃত্যু মুখে পড়িয়াও অনাহত শরীরে জীবিত রহিয়াছি—নিতান্ত আশ্চর্য্য হইয়া কিছুক্ষণ ভাবিলাম। উঠিয়া হাঁটিতে পারি কিনা পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা হইল।

এমন সময়ে অল্প দূরে একটা অনুচ্চ গোঁ-গোঁ শব্দ শুনিতে পাইয়া চমকিয়া উঠিলাম। একবার মনে হইল—হয়ত কোন হিংস্র জন্তু আহার শীকার করিতেছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া চারিদিক চাহিয়া—অল্প দূরে—উলুবন সংলগ্ন রেলরাস্তার পুলের উপরে এক ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়া প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। এক বীভৎসমূর্ত্তি নর-রাক্ষস কোন অসহায়া রমণীর কণ্ঠ-দেশ দুই হস্তে সজোরে চাপিয়া প্রাণবিনাশ করিতেছে,—শ্যেন-ধৃতা কপোতীর মত রমণী নিষ্ফল চেষ্টায় ছট্‌ফট্ করিতেছে;

আততায়ী আকাশের দিকে চাহিয়া দাঁতে দাঁত কামড়াইতেছে, মুখে তাহার চন্দ্রালোক পড়িয়া দুই চক্ষু ভীষণ দেখাইতেছে! ভয়ে ও বিস্ময়ে একেবারে অভিভূতা—মুগ্ধা হইয়া আমার বাক্‌শক্তি রোধ হইল; মনের প্রবল ইচ্ছা—দৌড়াইয়া গিয়া জোর করিয়া তখনি সেই অসহায়ার জীবন রক্ষা করি, কিন্তু পারিলাম না,—শরীর অবশ, নিথর, একটা কথা কহিবার জন্য বুক যেন ফাটিতেছিল, অথচ বলিবার সামর্থ্য ছিল না! স্বপ্নে চোর দেখিলে অনেকের যেরূপ হয়—আমার তখন তদবস্থা। আর দাঁড়াইতে না পারিয়া বসিয়া পড়িলাম, বুঝি আবার জ্ঞান হারাইলাম।

কিছুকাল পরে—অতি নিকটে কোনও গুরুভার পতনের শব্দে আমার চমক ভাঙ্গিল, অমনি দাঁড়াইয়া দেখি—সেই হিংস্র পুরুষ এক দৃষ্টে আমাকে দেখিতেছে, কার্য্য শেষ করিয়া রমণীর মৃতদেহকে বনমধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে। আমাকে দেখিয়া সে-ও বোধ হয় বিস্মিত বা ভীত হইয়া থাকিবে, যেমন আমি নড়িয়াছি, অমনি জ্যোৎস্না-ধবলিত-প্রান্তর-বক্ষে শয়তানের মত দ্রুতপদে ছুটিয়া পলায়ন করিল! নিম্নে চাহিয়া দেখিলাম—মৃতদেহটী প্রায় আমার পায়ের নিকটে, পা'দুখানি তাহার বনের বাহিরে পড়িয়াছে।

ভালরূপে তাহা দেখিতে লাগিলাম, স্ত্রীলোকটী যুবতী ছিল, অঙ্গসৌষ্ঠবে সুন্দরী, চিনিতে পারিলাম না! সমস্ত মুখে রক্ত,

জিহ্বা অনেকটা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, রক্তাক্ত মুখে কৃষ্ণ চক্ষুতারা দুইটী কোটর হইতে ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া বড়ই ভয়ঙ্কর দেখাইতেছিল; আহা—কি নিদারুণ যন্ত্রণায় অভাগিনীর প্রাণ বাহির করা হইয়াছে!

দেহে তাহার প্রাণের চিহ্নমাত্র ছিল না, আর তাহার কোন সাহায্যই প্রয়োজন হইবে না, তবে এখানে বিলম্ব করিয়া লাভ কি, পুলিসে এই মৃতদেহ লইয়া কম হুলুস্থুল করিবে না; সুতরাং সাক্ষীমঞ্চে বা আসামীর কাঠগড়ায় উঠিবার প্রবৃত্তি না থাকায় প্রস্থানের উদ্যোগ করিলাম। পরিধানের কিছুই ছিন্ন হয় নাই, পাদুকা দুইখানিও পূর্ব্বের মত পায়ের সঙ্গে তেমনি বাঁধা আছে। শিথিল বস্ত্রাদি ভালরূপ ঝাড়িয়া ও কষিয়া পরিধান করিয়া রেল রাস্তার উপরে উঠিলাম। কোথায় আসিয়াছি জানি না, রাস্তার একদিকে বহু দূরে আলোক দেখিতে পাইয়া নিশ্চয়ই কোন ষ্টেশন হইবে ভাবিয়া তদভিমুখে চলিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ চলিবার পর শ্রান্ত হইয়া ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে উপস্থিত হইলাম।

ষ্টেশনে আসিতেই কলিকাতা যাইবার গাড়ী পাইলাম। তাড়াতাড়ি টিকিট করিয়া সম্মুখে যে গাড়ী পাইলাম তাতেই উঠিয়া বসিলাম, ট্রেন তখন ছাড়িয়া দিল।

সেই কক্ষে একজন মাত্র যাত্রী বসিয়াছিল, কিন্তু লোকটীকে

দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম - এই না সেই হত্যাকারী!—হাঁ—ঠিক সেই লোক, ভুল নয়—ধাঁধা নয়—নিশ্চয়ই সে।

কিন্তু আমি মুগ্ধ হইলাম—তাহার শান্ত ও সুন্দর মুখখানি দেখিতে দেখিতে; একি সেই মুখ—ইতিপূর্ব্বে যাহার বীভৎস ভাবে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়াছিলাম—কি পরিবর্ত্তন! এমন সুন্দর পুরুষ কি খুনী হয়! অনেক পুরুষের আকৃতি চক্ষে পড়িয়াছে—এমন রূপবান যুবক আর কখনও দেখি নাই। ভাবিতে লাগিলাম—বাহিরের এমন কন্দর্পের রূপ, অন্তরে রাক্ষসের নিষ্ঠুরতা—লোকটী কি ভীষণ!

যাহা হউক, তাহার পরিচয় জানিতে কৌতূহল হওয়ায় আমিই প্রথম কথা কহিলাম। সে-ও হঠাৎ আমাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল, কিন্তু আমায় চিনিতে পারিল না। চিনিবে কিরূপে—চিনিবার মত করিয়া সে ত আমায় তখন দেখে নাই, দূরে বনমধ্যে আমার দিকে চাহিয়াই ভয়ে পলাইয়াছিল। আমি আর সে প্রসঙ্গের উত্থাপন না করিয়া নিজের সত্য-মিথ্যা-জড়িত যে পরিচয় দিয়াছিলাম, তাহাই বিশ্বাস করিয়া সে সন্তুষ্ট হইল।

গাড়ীতে অন্য কেহ উঠে নাই, আমরা দু'জন পরস্পর কথোপকথনের আনন্দে মগ্ন হইয়া চলিয়াছি। উচ্চ শিক্ষিত, চতুর, হাল ফ্যাসনে ফিট্‌ফাট্ সুরসিক ভদ্রলোক সে, বেশ প্রফুল্ল

ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল, বলিবার ভঙ্গী এবং কণ্ঠস্বরও চমৎকার; বাঃ—কি অদ্ভুত ক্ষমতা! এতবড় একটা খুন কেমন অনায়াসে হজম করিতেছে—সাক্ষাৎ শয়তান!

আবার ভাবিলাম—আমিই বা কম কিসে? আমিও ত বাপের ঘর, রসিকের সংসার, কিশোরীলালের বিলাস কক্ষ জ্বালাইয়া পোড়াইয়া আসিয়াছি; ইনি ব্যারিষ্টার—আমি বাঈজী, বিষের ছুরি আমাদের কাহারই কম শাণিত নয়! আমি দেখিব—এই পুলিনবাবুর দৌড় কতদূর; বানর, ছাগল, মেষ লইয়া অনেক খেলা খেলিয়াছি, এইবার সাপ লইয়া খেলিব. যদি মরি—সে মরণে একটা গর্ব্ব আছে!

সুযোগও হইল। রসালাপের শেষভাগে পুলিনবাবু বলিল—তাহার প্রেয়সীও দেখিতে অবিকল আমারই মত ছিল, আজ সকালে প্রণয়ের কঠিন নিগড় ছিন্ন করিয়া মুক্ত বিহঙ্গিনীর মত সে কাহার সহিত কোথায় উধাও হইয়াছে, আমাকে দেখিয়া তাঁহার সেই প্রেয়সী বলিয়াই ভ্রম হইয়াছিল।

সামান্য প্রতিবাদ ছলে আমি বলিলাম—"হইতে পারে, কচিৎ কখনও দুই চেহারায় পরস্পর সাদৃশ্য লক্ষিত হয়; কিন্তু আপনি যতদূর বলিতেছেন—তাহা রহস্য ভিন্ন আর কিছু মনে হয় না।"

সে দৃঢ়তার সহিত বলিল—"চলুন আমার সঙ্গে, আপনাকে

তাহার ফটো দেখাইব, আরসিতে অমনি নিজের মূর্ত্তিটী দেখিয়া মিলাইয়া লইবেন।"

আমি সম্মত হইলাম। বুঝিলাম—তাহার এই প্রস্তাবের মূলে হয় ত কোন উদ্দেশ্য থাকিবে; কিন্তু আমার ভয় কি! এইমাত্র যে মৃত্যুমুখ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, মরণও যাহাকে ভয় করিয়াছে—তাহার আবার ভয়!

বৌবাজারের একখানি দোতলা বাড়ীর সম্মুখে মোটর হইতে নামিলাম, এক বৃদ্ধা পরিচারিকা ভিতর হইতে দরজা খুলিয়া দিল, আমরা উপরে উঠিয়া গেলাম। পুলিনবাবু যাহা বলিয়াছিল—মিথ্যা নয়, সত্যই সোণার চেহারাখানি ঠিক যেন গতের আঠার বৎসর পূর্ব্বেকার আমি। কিন্তু চক্ষের চাহনিটুকু সোণার বড়ই সামা—আধ আধ লজ্জামাখা—দেখিয়া সাধ মিটে না। ভাবিলাম—গত রাত্রে এই অভাগিনীরই জীবন-খেলা ফুরাইয়াছে, আহা—কোন্ প্রাণে, কোন্ স্বার্থের লোভে এমন স্বর্গের পারিজাতকে পিষিয়া নষ্ট করিল!

পুলিনবাবু অনুরোধ করিল—এখন হইতে সে আমায় 'সোণা' নামেই ডাকিবে, আমিও যেন তাহাকে সোণার শোক ভুলাইবার জন্য এখানে সোণার অভিনয়ই করিতে থাকি। আমার তাহাতে আপত্তি কি!

সোণার স্মৃতি বিস্মৃত হইবার জন্য পুলিনবাবু মধুবারি

আনাইল ; ফলে, আমিও তাহার অনুরোধ উপেক্ষায় অক্ষম হইয়া তাহার আতিথ্য গ্রহণে সে রাত্রি তথায় জাগিয়া কাটাইলাম।

সোণার একটী সেতার ছিল, সুর বাঁধিয়া বাজাইলাম, পুলিনবাবু আহ্লাদে বলিয়া উঠিল, "বাহবা—কি মিঠা হাত! এ যে অবিকল আমার সেই সোণা!"

আমি বলিলাম—"না, খাঁটী নয়—এ নকল-সোণা।"

পরদিন সকাল বেলাও উভয়ে সেইখানে কাটাইলাম। দ্বিপ্রহরে পুলিনকে বলিলাম—"এতক্ষণ ত তোমার অতিথি হইয়া আমি এখানে কাটাইলাম, এইবার তুমি আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া বন্ধুত্বের মর্য্যাদা রাখ।"

পুলিন হাসিয়া বলিল—"নিশ্চয়ই রাখিব, আমি ত ইহাই আশা করিয়াছিলাম।"

আমাদের বাহির হইতে বেলা তিনটা বাজিয়া গেল। গাড়ীতে উঠিয়া চলিয়াছি, কিন্তু মনে একটা উৎকণ্ঠা পূর্ব্বদিন হইতেই জাগিয়াছিল—এই সোণা মেয়েটি কে! পুলিনকে জিজ্ঞাসা করিয়া কোন সদুত্তর পাই নাই। সে বলিয়াছিল—সোণা একটী সাধারণ বারাঙ্গনা। উত্তরটা সে যেন একটু ভাবিয়া দিয়াছিল। তাহার বলিবার ভঙ্গী এবং সোণার গৃহশ্রী দেখিয়া পুলিনের কথা বিশ্বাস করিতে পারি নাই। গৃহমধ্যে অনুসন্ধান করিতে পারিলে তাহার চিঠি-পত্র দেখিয়া হয়ত কোন পরিচয় পাইতে পারিতাম, কিন্তু

পুলিনের সম্মুখে সে অবসর মিলিল কৈ! যাহা হউক, পরে সে সুযোগ করিয়া লইব—এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বড় রাস্তার চৌমাথা পর্য্যন্ত আসিয়াছি—খবরের কাগজওয়ালা হাঁকিল—"আজিকার ভীষণ খবর, চলন্ত রেলগাড়ীতে হীরাবাঈ খুন।"

আমি চমকিয়া উঠিলাম, ভাবিলাম—সে কি! খুন হইল একজন, আর রাষ্ট্র হইল আমার নাম! আমি ত এই জীবিত।

আশাতীত ফল লাভ করিলে মানুষের মুখের ভাব যেরূপ হয়, পলকের জন্য পুলিনের মুখমণ্ডল তদ্রূপ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে-ভাব গোপন করিয়া যেন খুব আশ্চর্য্য হইয়া সে বলিল—"একি খবর! তুমিই ত হীরা বাঈ,—না?

আমি বলিলাম—"হাঁ?"

"তুমি খুন হইয়াছ—এ কি রকম ব্যাপার?"

ঘটনাটা যদিও কতকটা বুঝিয়াছিলাম, তথাপি গোপন করিয়া বলিলাম,—"আমি ত কিছু জানি না!"

একখানি কাগজ কিনিয়া উভয়ে পড়িতে পড়িতে চলিলাম। কাগজের একস্থানে বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—"ভীষণ দুর্ঘটনা, নিষ্ঠুররূপে নারী হত্যা, চলন্ত ট্রেণে ভারত-বিখ্যাত বাঈজী হীরাবাঈ খুন?"

অবস্থাটা আরও বুঝিবার জন্য তাহার নিম্নের পংক্তি কয়টি পড়িতে লাগিলাম :—

"গতকল্য সন্ধ্যার পর কলিকাতাগামী একখানি প্যাসেঞ্জার ট্রেণের প্রথম শ্রেণীর একখান গাড়া হইতে ভারত বিখ্যাত বাঈজী হীরাবাঈকে কোন দুর্ব্বৃত্ত খুন করিয়া গাড়ী হইতে মৃতদেহ ফেলিয়া দিয়া পলায়ন করিয়াছে। তাহাদের ধস্তাধস্তিতে গাড়ীর দরজার একখানি কাঁচ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, গাড়ীতে রক্তের চিহ্ন রহিয়াছে। প্রত্যুষে রেল রাস্তার পার্শ্বে কোম্পানীর লাইন-ম্যান প্রথমে মৃতদেহ দেখিতে পায়। পুলিস তদন্ত চলিতেছে, আসামী এখনও ধরা পড়ে নাই।"

উভয়েই বুঝিলাম—সোণার মৃতদেহ আমার ভাবিয়া লোকে ভ্রম করিয়াছে—কিন্তু কেহই কিছু প্রকাশ করিলাম না। পুলিন চিন্তিত হইলেও তাহার চক্ষু নাচিয়া উঠিল, অতি উৎসাহে আমার হাত হইতে কাগজটি লইয়া আবার পড়িতে লাগিল। আমি ভাবিতে লাগিলাম—কিন্তু আমি মরিয়াছি—হীরাবাঈ খুন হইয়াছে—ইহা কিরূপে সিদ্ধান্ত হইল? মৃতদেহ আমার বলিয়া কে সনাক্ত করিল? পরেশ বাবু নিশ্চয়ই কিছু প্রকাশ করেন নাই। গাড়ীর চলন্ত অবস্থায় দরজা খোলা থাকার জন্য কাঁচ ভাঙ্গিতে পারে, কিন্তু রক্ত আসিবে কোথা

হইতে—কিছুই স্থির বুঝিতে পারিলাম না। রেলগাড়ী সংক্রান্ত ঘটনা পুলিন জানিত না, আমাকে আবার প্রশ্ন করিল—“তোমার নাম কিরূপে রাষ্ট্র হইল—কাল তুমি কোথায় ছিলে ?”

আমি বলিলাম—“তোমার সঙ্গেই ত কাল একত্রে আসিয়াছি, কিরূপে জানিব বল ?”

তারপর সে আর কিছু বলিল না, চিন্তিত হইল—বেশ লক্ষ্য করিলাম। তাহার চিন্তার কারণ আমার অজ্ঞাত নয়। আমি এখন প্রকাশ হইলেই তাহার বিপদ, আমি প্রচ্ছন্ন থাকিলে আর কোন ভয় থাকে না। তাহার মনোভাব বুঝিয়াও একটু রহস্য করিবার অভিপ্রায়ে বলিলাম—“তবে ত এখনি আমার প্রকাশ হইয়া প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য।”

পুলিনের মুখখানি সাদা হইয়া গেল, বলিল—“তা—বটে, কিন্তু—।”

আমি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—“চাপিয়া বলিতেছ কেন—তোমার কি কোন অন্য অভিপ্রায় আছে ?”

সে বলিল—“নাঃ, অন্য অভিপ্রায় আর কি থাকিবে ? তবে এরূপ মজার জনরব আমার সম্বন্ধে রাষ্ট্র হইলে আমি কি করিতাম—জান ?”

আমি বলিলাম—“প্রচ্ছন্ন থাকিয়া রহস্যটা দেখিয়া লইতে—কেমন ?”

পুলিন হাঃ—হাঃ শব্দে হাসিয়া উঠিল। আমি বলিলাম—"তা—ঘটনাটা কিরূপ দাঁড়ায়, কয়েকটা দিন গা ঢাকা দিয়া দেখিলে মন্দ কি?"

সে বলিল—"মন্দ কেন? বরং খুবই মজা হবে, মৃত্যুর পর তোমার সম্বন্ধে সকলে কিরূপ সমালোচনা করিবে, বাঁচিয়া থাকিয়া সে রহস্য উপভোগ করিবার সুযোগ ক'জনের ভাগ্যে ঘটে? দেখিবে তোমার মত বিখ্যাত গায়িকার সম্বন্ধে কত বড় বড় কাগজে কত রকম লেখা বাহির হইবে। তুমি কয়েকটা দিন একটু চুপ করিয়া দেখ—কি হয়; তারপর ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত হইলে, আমি এই বিষয়ে দস্তুর মত একখানা নাটক লিখিয়া ফেলিব।"

আমি বলিলাম—"ঠাট্টা নয়, সত্যই আমি এখন প্রকাশ হইব না, দেখি—কি হয়।"

তখন আমরা প্রায় আমার বাড়ীর কাছে আসিয়াছিলাম, তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে গাড়ী ফিরাইয়া চালককে আমার বাগান-বাড়ীর ঠিকানা বলিয়া দিয়া তদভিমুখে গাড়ী চালাইতে আদেশ করিলাম। পুলিন আশ্বস্ত হইল।

কলিকাতার উপকণ্ঠে—গঙ্গার উপরে আমার অনতি-বৃহৎ সুসজ্জিত নির্জ্জন বাগানখানি পুলিনের বড়ই পছন্দ হইল। উদ্যান-রক্ষক একজন মাত্র ভৃত্যকে সতর্ক করিয়া ফটক পূর্ব্বের

মত বন্ধ রাখিবার আদেশ দিয়া আমরা তথায় অবাধ আনন্দে দিন কাটাইতে লাগিলাম। মুক্ত বাতাস, নদীর দৃশ্য, ঢেউয়ের শব্দ, ফুলের সৌরভ, নীরবে—নির্জ্জনে আমরা দুইজন—পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া—মৃদু হাসিয়া—প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া উপভোগ করিতাম; সাত দিন আমাদের সাত ঘণ্টার মত কাটিয়া গেল।

একদিন সকালে উঠিতে আমার অনেক বেলা হইল। পুলিন কখন উঠিয়া গিয়াছে জানি না, জানালা হইতে দেখিলাম গঙ্গার ধারে বেড়াইতেছে। বসিবার ঘরে গিয়া দেখি—টেবিলের উপর সেদিনের একখানি সংবাদপত্র খোলা রহিয়াছে। কাগজে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে—"হীরা-বাঈজীর হত্যাকারী গ্রেফ্‌তার—সহরে মহা হৈ-চৈ!"

কাগজের আজ ভারি ধূম, এক পয়সার কাগজ আট পয়সায় বিকাইতেছে। খুব আগ্রহের সহিত সমস্ত ঘটনাটা তাড়াতাড়ি পড়িয়া ফেলিলাম।

আমাকে হত্যা করিবার অপরাধে পরেশবাবু গ্রেফ্‌তার হইয়াছেন, জামিন গ্রাহ্য হয় নাই, তাঁহাকে কারাগারে রাখিয়া বিচারের অপেক্ষা করা হইতেছে। যে রেলের বাবুটী আমাকে পরেশবাবুর গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিয়াছিল, সে পরেশবাবুকে চিনিয়াছে এবং মৃতদেহও আমার বলিয়া সনাক্ত করিয়াছে।

কলিকাতার ষ্টেশনের টিকিট-কালেক্টর ও অনৈক ঝাড়ুদার পরেশ-বাবুকে রক্তাক্ত কলেবরে ষ্টেশনের বাহিরে যাইতে দেখিয়াছে; গাড়ীর দরজার কাচ ভাঙ্গা এবং গাড়ীতে রক্তের চিহ্ন তাহারা পুলিসকে দেখাইয়াছে। আমার বাড়ীর চাকর দ্বারবানেরা, আমার সঙ্গীতের সঙ্গিগণও মৃতদেহ আমার বলিয়া সনাক্ত করিয়াছে এবং সেই রাত্রে আমার যে একাকী সেই ট্রেণে কলিকাতায় ফিরিবার সম্ভাবনা ছিল তাহাও প্রকাশ করিয়াছে।

আহা, বেচারী পরেশবাবু—তাঁহার এমন দুর্ভাগ্য! নিরপরাধ তিনি—কঠিন কারাগারে মৃত্যু-বিভীষিকায় ছট্‌ফট্ করিতেছেন, আর প্রকৃত হত্যাকারী পুলিনবাবু—যাহাকে হত্যা করা হইয়াছে বলিয়া সহরময় সাড়া পাড়য়াছে—সেই হীরাবাঈজীর সহিত প্রেমালাপ ও পান-ভোজনের আনন্দে মগ্ন থাকিয়া হাসিতে হাসিতে তাহার জন্য ফুলের তোড়া হাতে লইয়া গৃহ প্রবেশ করিতেছে! পুলিন কি সৌভাগ্যবান্!!

খবরের কাগজের সংবাদ নিশ্চয়ই পুলিন আমার পূর্ব্বে পড়িয়াছিল, সে প্রসঙ্গে তাহার সহিত কোন কথাই হইল না; কিন্তু অন্তরের আনন্দটা চাপিয়া রাখিতে পারিল না, আমায় সমস্ত দিন অধিকতর আদর যত্ন করিতে লাগিল, স্পষ্ট বলিল—সে আমায় ভালবাসে, আমায় চিরদিন না পাইলে তাহার জীবন ব্যর্থ হইবে, আমায় সে বিবাহ করিতে প্রস্তত।

যোগাযোগ মন্দ নয়—আমাদের দু'জনেরই কেহ নাই, দু'জনেরই সমান অদৃষ্ট, এ মিলন বিধাতার অভিপ্রেত—একেবারে রাজ-যোটক!

সন্ধ্যার পর গঙ্গার বাঁধা ঘাটের উপর দুইজনে বসিয়া আছি, শীতের প্রারম্ভ হইলেও আনন্দবশতঃ নদীসৈকতের শীতল বাতাস আমাদের বসন্তের মলয় সমীরণ বলিয়া মনে হইল। আমি সেতার লইয়া বাজাইতেছিলাম, পুলিন ধীরে ধীরে উঠিয়া আমার সম্মুখে নীরবে ইতস্তত বেড়াইতে বেড়াইতে শুনিতেছিল; তখনও চন্দ্রোদয় হয় নাই, কিন্তু নির্ম্মল আকাশের নক্ষত্রালোকে গঙ্গাতীরে অন্ধকার তেমন গাঢ় হইতে পারে নাই, নিকটের মানুষ চিনিতে কষ্ট হয় না।

বাজনা থামাইয়া সেতারটী যেমন নিম্নে রাখিয়াছি, পুলিন অমনি আমার নিকটে আসিয়া কর্কশ গম্ভীর স্বরে বলিল—"হীরা! যদি তোমার কোন ইষ্টদেব থাকে—স্মরণ কর।"

আমি বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কেন?"

"হাঁ, এই তোমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত"—বলিয়া কোটের পকেট হইতে সে পিস্তল বাহির করিয়া আমার বক্ষঃ লক্ষ্য করিল।

আমি বলিলাম—"আমায় কি তুমি খুন করিবে?"

সে বলিল—"হাঁ, করিব; জগতের চক্ষে যে একবার মরিয়াছে, তাহার আর বাঁচিয়া থাকিয়া কাজ নাই।"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"বেশ, আমি প্রস্তুত, এই বুক পাতিয়া আছি, তুমি গুলি কর।"

পুলিন পিস্তলের ঘোড়া টিপিল—শব্দ হইল না, গুলি ছুটিল না—ধোঁয়া বা আগুন কিছুই নাই!

আমি বলিলাম—"কৈ প্রাণনাথ—কর গুলি, তোমার প্রাণ তুমি লইবে—তাহাতে বিলম্ব কি হেতু?"

পুলিন আবার ঘোড়া টিপিল, কিন্তু এবারেও নিষ্ফল! আমি হোঃ হোঃ শব্দে হাসিয়া উঠিলাম। পুলিন অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া পিস্তল পরীক্ষা করিল—পিস্তল বে-কল। ক্রোধে ও বিরক্তিতে অমনি হাতের পিস্তল আমার মস্তক লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিল, পিস্তল আমার কাণের পাশ দিয়া সবেগে গঙ্গার জলে পড়িল। পুলিনের তখন সেই হিংস্র স্বরূপ-মূর্ত্তি—সোণাকে খুন করিবার সময় যেরূপ দেখিয়াছিলাম! আমাকেও গলা টিপিয়া মারিবার অভিপ্রায়ে আক্রমণ করিতে আসিল।

এইবার আমি পিস্তল বাহির করিয়া বলিলাম—"সাবধান পুলিনবাবু, তোমার পিস্তল বে-কল করিয়াছি—কিন্তু আমার পিস্তল ঠিক আছে; আমাকে সত্য সত্যই সোণা ভাবিও না, আমি বজ্রের মত কঠিন হীরা—আমাতে জহর আছে।"

পুলিন যেন হঠাৎ সর্প দেখিয়া লাফাইয়া উঠিল, বলিল, "না-না, মারিও না।"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"যাহারা পরের প্রাণ লইতে চায়, নিজের প্রাণের জন্য তাহাদের এত মমতা—ছিঃ! একটা খুন করিয়া সাম্‌লান যায় না, তুমি দুই দুইটা খুন গুম্ করিবে—স্বপ্নেও সে কথা মনে স্থান দিও না, আরও শত বিপদে তোমায় জড়াইয়া ধরিবে।"

পুলিন তখন মিনতিস্বরে বলিল—"তুমি ঠিক বলিয়াছ, আমি অতটা তলাইয়া বুঝিতে পারি নাই, আমায় মাফ কর—হীরা!"

আমি বলিলাম—"বেশ, মাফ করিব, কিন্তু এক সর্ত্তে—"

"বল—"

"আগে তুমি বল—সে সর্ত্তে তুমি সম্মত হইবে?"

"সাধ্যের অতীত না হইলে—"

"সাধ্যের অতীত নয়।"

"তবে নিশ্চয়ই তোমার কথা রাখিব, ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি।"

"না না, সে শপথ করিও না, ঈশ্বর তোমারও নাই, আমারও নাই; যদি শয়তানের শক্তিতে তোমার বিশ্বাস থাকে—তাহারই নামে প্রতিজ্ঞা কর; আর যদি কিছুই না মান—মাত্র বাক্য দান কর।

"বেশ, বল—কি তোমার প্রস্তাব।"

"চিরজীবন তুমি আমারই থাকিবে, কেমন,—প্রস্তুত ?"

পুলিন মাথা নত করিল ; কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া পরে জিজ্ঞাসা করিল— "তুমিও জীবনে কখন হীরাবাঈ নামে প্রকাশ হইবে না ?"

আমি বলিলাম—"না।"

"বিশ্বাস কি ?"

"আমার মুখের কথা ; সে অভিপ্রায় থাকিলে বহুক্ষণ পূর্ব্বে তোমায় হাত-কড়ি পরাইতে পারিতাম।"

"ভাবিয়াছ কি—তুমি অপ্রকাশ থাকিলে এই মোকদ্দমার পর তোমার সমস্ত সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইতে পারে ?"

"ভাবিয়াছি ; তথাপি আমার এত নগদ অর্থ লুক্কাইত থাকিবে—তুমি আমি আজীবন অজস্র ব্যয় করিলেও ফুরাইতে পারিব না।"

"বেশ ভাবিয়া দেখ হীরা—এমন স্বাধীন স্বচ্ছন্দতা ত্যাগ করিয়া তুমি আমার অধীন হইয়া চিরজীবন থাকিতে পারিবে কি ?"

"তুমি যদি আমার অধীন হও—আমি কেন হইব না ? তোমাকে পাইলে আমার সে অধীন জীবন অমৃতময় হইয়া উঠিবে।"

"উত্তম, আজ হইতে আমি তোমারই।"

"আমিও তোমাকে গলার হার করিয়া বুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিব, হীরা আবার হিরণ হইয়া—গরলের পরিবর্ত্তে সুধা দানে তোমায় তৃপ্ত রাখিবে।"

ভাবিলাম—এত দিনে বুঝি সাপ বশীভূত হইল! তথাপি সন্দেহ একেবারে ঘুচিল না—সর্পাঘাতেই না সাপুড়ের মৃত্যু হয়?

* * * *

(১৪)

পরদিন প্রভাতে পুলিন বিদায় চাহিল, কলিকাতায় যাইয়া আবার রাত্রির পূর্ব্বেই এখানে ফিরিবে। তাহার আগ্রহাতিশয্যে আমি অসম্মত হইতে পারিলাম না। কিন্তু আমি যে এখানে নিতান্ত একা—এ কথা তাহাকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া বলিয়া যত সত্বর সম্ভব ফিরিবার জন্য অনুরোধ করিলাম। সে সহাস্য মুখে সম্মত হইয়া বিদায় গ্রহণ করিল। বাগানের ফটক অবধি আমি তাহার অনুগমন করিলাম, যতক্ষণ তাহাকে দেখা গেল—চাহিয়া দেখিলাম।

পুলিন হিংস্র প্রকৃতির লোক—জানি। কিন্তু তথাপি তাহার রূপে, তাহার মিষ্ট কথায় এবং শিষ্ট ব্যবহারে আমি এমন একটা মাধুর্য্য আস্বাদন করিতাম, যাহাতে তাহাকে অনবরত দেখিবার জন্য একটা লুব্ধ আকাঙ্ক্ষা গুপ্তভাবে ক্রমশঃ আমার অন্তরে বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল! হইতে পারে—ইহা আমার নারী হৃদয়ের দুর্ব্বলতা, কিন্তু যাহা সত্য, তাহা বলিতে কুণ্ঠিত হইব কেন? অথবা ইহাই বুঝি ক্ষেত্র ও পাত্র ভেদে প্রণয় বা প্রেম নামে অভিহিত হইত!

পুলিনকে যাইতে দিলাম সত্য, কিন্তু শঠের প্রেমে

নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলাম না। তখনও সোণার প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারি নাই; পুলিন হয়ত কলিকাতায় সোণার বাসা উঠাইয়া দিয়া সমুদয় জিনিসপত্র স্থানান্তর ও নষ্ট করিয়া সাবধান হইবে—তাহাকে সে সুযোগ দিব কেন? আমি চাই—তাহাকে মুষ্টিবদ্ধ রাখিতে।

তাহার প্রস্থানের কিছু পরেই আমিও ট্যাক্সি করিয়া বৌবাজারের সেই বাসায় পৌঁছিলাম। গোকুল নামে একটা উড়িয়া চাকর এবং লছমী নামে একটী বুড়ী ঝি সোণার পরিচর্য্যা করিত। কর্ত্রীর অন্তর্ধানে গৃহের দুই চারিটা ঘটী গেলাস সহ গোকুলচন্দ্রও কোন্ গোকুলে উধাও হইয়াছে! লছমীবুড়ী নীচের ঘরে লেপ মুড়ি দিয়া জ্বরে পড়িয়া কাতরাইতেছিল, পিপাসায় এক ফোঁটা জল পাইতেছিল না। আমার কণ্ঠস্বর শুনিয়া বুড়ী কাঁদিয়া ফেলিল, আমিও তাড়াতাড়ি গিয়া তাহার শিয়রে বসিলাম।

* * * *

(১৫)

পুলিনকে সে বাড়ী ছাড়িতে দিলাম না, বরং সোণার গদী অধিকার করিয়া দিনে দিনে সেখানে সোণা হইয়া জমকাইয়া বসিলাম। ব্যয়ভার পুলিনকে কিছুই বহন করিতে হইত না। ইহাতে তাহার বাটী থাকিয়াও প্রত্যহ আমার সহিত মিলনের সুবিধা হইল, কাছারীর ছুটীর দিনে তাহাকে লইয়া বাগানে যাইতাম।

মোকর্দ্দমার অবস্থা পরেশবাবুর পক্ষে ক্রমশঃ খারাপ হইয়া উঠিতেছিল। গত তারিখে সাক্ষীর মুখে মাজিষ্ট্রেট এমন প্রমাণ পাইয়াছেন, যাহাতে পরেশবাবুর প্রাণ রক্ষার আর কোন আশাই থাকিল না। এই সাক্ষী—একজন দেশীয় খৃষ্টান ধর্ম্মপ্রচারক।

সেই ব্যক্তিই প্রথমাবধি সমুদয় প্রমাণ পুলিসকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন; খুনের রাত্রে সেই ট্রেণে পরেশবাবুর পার্শ্বস্থ কক্ষের তিনি যাত্রী ছিলেন, সমস্ত ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। বুঝিলাম —ইহার অযাচিত অনুগ্রহে শীঘ্রই পরেশবাবুর ভবযন্ত্রণার অবসান হইবে।

এদিকে পুলিন প্রায় প্রত্যহই আমায় দেখিতে আসিত; আমায় যেন সে কত ভালবাসিত, যেন একান্তই সে আমার প্রণয়ী

হইয়া উঠিয়াছিল, আমায় না দেখিয়া সে যেন থাকিতে পারিত না, আমিও তখন কল্পনার নেত্রে কতই স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম! পুলিন প্রকৃত আমার হইলে সুখের অবধি থাকে না; অর্থের আমার অভাব নাই, যশ যথেষ্ট আছে, রূপের প্রশংসাও অনেকের মুখে শুনিয়াছি—পুলিনও সে সুখ্যাতি কম করে না—তবে কিসে আমি তাহার অযোগ্যা? জাতিভেদ সে মানে না, ধর্ম্মের ত কোন অস্তিত্বই সে স্বীকার করে না; সম্ভ্রম—অর্থ থাকিলে সম্ভ্রম কিনিতে পাওয়া যায়।

সহসা মাথায় এক খেয়াল চাপিল—পরেশবাবু ত কারাগারে, এই অবসরে একবার তাঁহার সুন্দরী স্ত্রীকে দেখিয়া আসিলে হয় না? একবার দেখিব—কোন্ অহঙ্কারে—কোন্ রূপবতীর প্রণয়ে প্রাণ বিকাইয়া—পরেশবাবু আমায় অবহেলা করিয়াছেন—সে কেমন রূপসী!

মনে মনে ধারণা ছিল—পরেশবাবুর গৃহিণী বড় ঘরের কন্যা,—সর্ব্বদা মূল্যবান বসন ভূষণে সজ্জিত থাকিয়া অহঙ্কারে মাটিতে পা ফেলে না; হয়ত আমার সঙ্গে কথাই কহিবে না। কিন্তু তাহাকে চক্ষে দেখিয়া আমার সে ধারণা দূর হইল। সে ছিল আমার কল্পনার ঠিক বিপরীত। পাত্‌লা খাট রকমের সুন্দর তাহার চেহারা খানি, বয়সে আমার অপেক্ষা পাঁচ সাত বৎসরের ছোট হইবে। অঙ্গে—হিন্দু সধবা ও কুলবধূর

অবশ্য ব্যবহার্য্য কয়েকখানি সামান্য অলঙ্কার। মুখখানি বেশ সুন্দর—দেখিলে স্নেহ না করিয়া থাকা যায় না। সেই মুখ আজ বিষাদের ছায়ায় মলিন, ত্রাসে ও দুশ্চিন্তায় শরীর শুষ্ক, কেশ রুক্ষ, চক্ষু সিক্ত—কাঁদিতে কাঁদিতে লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে।

অতি নম্র এবং অমায়িক তাহার ব্যবহার। আমাকে দেখিয়া ক্রন্দনের ভাব গোপন করিয়া সমাদরে বসাইল এবং কি প্রয়োজনে গিয়াছিলাম জিজ্ঞাসা করিল। আমি বলিলাম—আমার একখানি বাড়ী নির্ম্মাণ করাইতে হইবে, সে সম্বন্ধে পরেশবাবুর সহিত পরামর্শের প্রয়োজন।

সে মৃদুস্বরে উত্তর করিল—"তিনি বাড়ীতে নাই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আছেন কোথায়?"

পার্শ্বস্থ এক পরিচারিকা বলিল—"সে অনেক কথা বাছা, বাবুর জন্যে এই আমরা খাবার লইয়া চলিয়াছি, পোড়ারমুখ পুলিসেরা—না-না বাছা, বুড় মানুষ, কি বলিতে কি বলিতেছি—"

পরেশবাবুর স্ত্রী আর চক্ষের জল চাপিয়া রাখিতে পারিল না। এই সময়ে অন্য এক পরিচারিকা একটী ছোট মেয়েকে আনিয়া—তাহার কোলে দিল, কন্যাকে বক্ষে চাপিয়া লইয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে সে নামিয়া গিয়া গাড়ীতে উঠিল।

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিয়া একটু মজা দেখিতে আমি

ছাড়িলাম না। তাহাদের শুনাইয়া—যেন আপনার মনে বলিতে লাগিলাম—"ও, তবে এই পরেশবাবুই রেলগাড়ীতে হীরাবাঈজীকে খুন করিয়াছেন !"

পরেশবাবুর স্ত্রী গাড়ী হইতে বলিয়া উঠিল—"না—না, তিনি কখনও এমন কাজ করেন নাই, সে কথা মিথ্যা।"

আমি বলিলাম—"হ্যাঁ, মিথ্যা বই কি ? পাপ কখনও গোপন থাকে না, ধর্ম্মের ঢাক আপনিই বাজে, এমন দুর্ব্বৃত্তের শীঘ্রই ফাঁসি হওয়া উচিত।"

পরিচারিকা রাগিয়া বলিল—"কোথাকার রাক্ষসী ! দূর হ'।"

"চুপ কর, মন্দ বলিও না ; লোকের দোষ কি ? দোষ আমাদের অদৃষ্টের"—বলিয়া প্রভু-পত্নী পরিচারিকাকে নিরস্ত করিল। তাহারা গাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেল। আমিও আমার গাড়ীতে উঠিয়া ফিরিয়া আসিলাম।

একদিন খবরের কাগজে এক নূতন সংবাদ পড়িলাম : কাগজের একস্থানে "শুভ সংবাদ" নিম্নে লিখিত ছিল—"খ্যাতনামা প্রবীণ উকিল ধরণীধর সেন মহাশয়ের একমাত্র কন্যা রমার সহিত, বিলাত প্রত্যাগত সুশিক্ষিত নূতন ব্যারিষ্টার—মিষ্টার পলিন ডটের শুভ পরিণয় শীঘ্রই সুসম্পন্ন হইবে।"

পড়িয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম—দম বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইল, ভাবিতে লাগিলাম—পাখী শিকল কাটিল না কি ?

ধরণীবাবুর কথা পুলিনের মুখে অনেক শুনিয়াছি, কিন্তু রমার নাম ত শুনি নাই! কাগজে লেখা রহিয়াছে—রমা ধরণীবাবুর একমাত্র কন্যা, পুলিন একথা কখনও আমায় বলে নাই!

পুলিনের উপর যত না হউক, রাগটা পড়িল সেই রমার উপরে; সে-ই ত আমার আশার ধন ছিনাইয়া লইতেছে। রমা কি সুন্দরী? আমার মত?—ইস্! পিতার একমাত্র কন্যা—অশেষ ঐশ্বর্য্য ও সম্ভ্রমের উত্তরাধিকারিণী—ইহাই হয়ত পুলিনকে প্রলুব্ধ করিয়াছে।

কিন্তু না, এ বিবাহ আমি হইতে দিব না। হউক রমা যত সুন্দরী, থাকুক তাহার যত সম্পদ সম্ভ্রম, আমি দেখিব—কেমন করিয়া আমার এই পাখী সে কাড়িয়া লয়; আমি ত ডাকিয়া আনি নাই, পাখী আপনিই উড়িয়া আসিয়া ধরা দিয়াছে; হয়ত পাখী আমারই থাকিবে, নতুবা পায়ের সেই ছিন্ন শৃঙ্খলে পাখীর গলা চাপিয়া চিরদিনের মত তাহার প্রেমের বুলি বন্ধ করিব; তথাপি অন্যের হইতে দিব না।

কিন্তু পুলিনবাবু লোকটী কি পাকা খেলোয়াড়! মনের ভাব মুখে বা চক্ষে একটুও ধরা-ছোঁয়া যায় না! এতবড় একটা খুন স্বচ্ছন্দে গোপন করিয়া কেমন নিশ্চিন্ত—কেমন হাসি-খুসী! সাহসের তাহার প্রশংসা না করিয়া পারি না। কিন্তু—সে কি জানে না যে, নিরপরাধ পরেশবাবুর গলার ফাঁসির দড়িতে

এখনি আমি তাহার কণ্ঠ-রুদ্ধ করাইতে পারি! আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা!

আবার ভাবিলাম—সত্যই কি সে রমাকে ভালবাসে? আমার ত মনে হয় না, তাহার মত চরিত্রের লোকের ভালবাসার উপযোগী হৃদয় থাকিতে পারে—এমন বিশ্বাস হয় না।

জানি—এমন লোককে প্রশ্রয় দেওয়া, এমন বেইমানকে বাঁচাইবার জন্য একজন নিরপরাধ নির্ম্মল চরিত্র ব্যক্তির জীবনান্ত করা অতি অসঙ্গত; কিন্তু কি করিব—উপায় নাই। স্বীকার করি—ইহা আমার মুগ্ধ হৃদয়ের হীন স্বার্থপরতা,—সে বড় সুন্দর—বড় সুন্দর! তাহাকে আমি চাই-ই—আমায় বাঁচিতে হইলে তাহাকে লইয়া বাঁচিতে চাই।

দেখিব প্রবঞ্চক—তুমি কত বড় খেলোয়াড়। তোমার মত চতুরকে বশীভূত করিতে—অঙ্গুলি সঙ্কেতে পৃথিবীময় ঘুরাইতে আমার বড় বেশী সময় লাগে না। হাঃ—হাঃ—এইত আমি চাই—এরূপ লুকোচুরি খেলা আমি বড় ভালবাসি।

তবে—পরেশবাবুর দুরদৃষ্ট, তা—আমি কি করিব? আমি কেন তাঁহার জন্য আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিব? তিনি আমার কে?—আমায় ত তিনি ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন!

সন্ধ্যার পরেই নির্লজ্জ পুলিন উপস্থিত হইল। আমিও প্রস্তুত ছিলাম—আজ যাহা হয় একটা শেষ বুঝাপড়া করিব। আর

চুপ করিয়া থাকিবার সময় নাই। কিন্তু এমন আমোদী লোক সে, আসিয়াই মধুর হাস্যে সমস্ত কক্ষ মুখরিত করিয়া একখানি আরাম কেদারা টানিয়া লইয়া আমার পাশে বসিল। খাদ্য ও পানীয় প্রস্তুত ছিল, তাহার মিষ্ট গল্পের মধুর রসে সিক্ত করিয়া উভয়ে সেগুলি উদরস্থ করিলাম; পুলিন সিগারেট ধরাইল, আমিও তখন কাজের কথা পাড়িবার ছলে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ভাল কথা, পরেশবাবুর মাম্‌লার খবর কি?"

বেশ সরলভাবে সে বলিল—"আহা, সে বেচারীর যদিও একটু জীবনের আশা ধুক্ ধুক্ করিতেছিল, এবার তাহাও গেল।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কিরূপ?"

"সরকারী উকীল ধরণীবাবুর হাতে মোকদ্দমা পড়িয়াছে, আসামীর আর নিস্তার নাই, ধরণীবাবুর হাত হইতে কোন দিন কোন আসামী নিস্তার পায় না।"

"মনে আছে—এই খুনের রাত্রেই—ঠিক পরের গাড়ীতে কলিকাতায় আসিতে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ—"

"শুধু সাক্ষাৎ নয়—'শুভদৃষ্টি' বল।"

আমি মনে মনে বলিলাম—বটে, প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করিলাম —"সংবাদ পত্রে পড়িলাম—এই সরকারী উকীল ধরনীবাবুর কন্যা রমার সহিত 'পলিন ভট্ট' নামে একটী ভদ্রলোকের শীঘ্রই শুভবিবাহ হইবে, সে কি তুমি?"

পুলিন একটুও টলিল না, কোন বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ না করিয়া বলিল—"হাঁ, সম্ভবতঃ আমি।"

"এ সুখবরটা—কই,—একদিনও ত আমাকে বল নাই?"

"প্রয়োজন হয় নাই।"

"প্রয়োজন হয় নাই?"

"না; মিঃ সেন এমন প্রকৃতির লোক যে মনের কথা কখনই কার্য্যের পূর্ব্বে প্রকাশ করেন না। আমি কিছুই জানিতাম না—সমস্তই তিনি স্বয়ং করিয়াছেন।"

"এই বিবাহ ব্যাপার—তোমার অগোচরে বা অসম্মতিতে—"

"আমার সম্মতি অসম্মতির তিনি কোনও দিন মুখাপেক্ষী নহেন, আমার উপর তাঁহার এরূপ অধিকার ও শাসন আছে।"

শুনিয়া আমার হাসি পাইল, বলিলাম—"কথাটা কিছু নূতন রকমের নয় কি? অভিভাবক স্বরূপ দুনিয়ায় তোমার কেহ আছেন না কি?"

"আছেন, একমাত্র—তিনি।"

"তাঁহার দুরদৃষ্ট!"

"কেন?"—বলিয়া পুলিন যেন একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। আমি নরম ভাবেই বলিলাম—"দুরদৃষ্ট নয় কি? ভদ্রলোক বৃদ্ধকালে এক অবিশ্বাসীকে বিশ্বাস করিয়া প্রতারিত হইতেছেন।"

পুলিন তেমনি উচ্চ স্বরে বলিল—"কিসে ?"

"নির্ম্মল-চরিত্র সাধু ভ্রমে একজন হত্যাকারীকে কন্যাদান করিতেছেন।"

অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পুলিন বলিয়া উঠিল—"হত্যাকারী !—কে হত্যাকারী ?"

স্বর আরও নরম করিয়া আরও স্পষ্ট ভাবে আমি বলিলাম—"হত্যাকারী তুমি, রেলগাড়ীর খুনের মোকর্দ্দমার তুমিই প্রকৃত আসামী।"

"মিথ্যা কথা।"

"না—সত্য কথা। পুলিনবাবু! একবার ভাবিয়া দেখ,—নিজের পাপ অপ্রকাশ রাখিয়া একজন নিরপরাধ ব্যক্তির প্রাণান্ত করিতেছ।"

পুলিন আসন হইতে একলাফে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"খবরদার, আর যেন অমন কথা মুখে আনিও না, সাবধান করিয়া দিতেছি।"

তাহার মত লোকের মুখের উপর এমন কথা বলিতে হইলে তন্মুহূর্ত্তে নিজের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য যে পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইয়া লইতে হয়—ইহা আমার স্মরণ ছিল; সুতরাং বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে লুক্কাইত পিস্তল বাহির করিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলাম—"ভয় দেখাইও না পুলিনবাবু,

আমি তোমার নিরীহ সোণা নই, তুমি ত জান—আমি পিস্তল ধরিতে জানি।"

পুলিনের মুখে আর কথা বাহির হইল না, গম্ভীর ভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, আমি বলিতে লাগিলাম—"যে খুনের দায়ে নির্দ্দোষ পরেশবাবু প্রাণ হারাইতে বসিয়াছে, সে খুন তোমাকেই করিতে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।"

রুক্ষ স্বরে পুলিন প্রশ্ন করিল—"আমাকে ?"

আমিও দৃঢ়স্বরে উত্তর করিলাম—"হাঁ—তোমাকে !"

তাহার সুর এবার নরমে নামিতে লাগিল—"তামাসা করিতেছ হীরা ?"

"না, আজ আর তামাসার কোন কথা বলিতেছি না।"

কিছুকাল উভয়েই নীরব হইয়া ভিন্ন দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিলাম। পরে পুলিনের ভাব হঠাৎ একেবারে বদ্‌লাইয়া গেল, দিব্য হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"হীরা, তখন তুমি কি আস্‌মানে ছিলে ?"

"আস্‌মানে কেন ?—রেলরাস্তার নিম্নের সেই উলুবনে। আর একটু হইলেই তোমার নিক্ষিপ্ত মৃতদেহটী আমার ঘাড়ের উপর পড়িত।"

"তাই নাকি ? আমি যে নিক্ষেপ করিয়াছি—কিরূপে জানিলে ?"

"নিজের চক্ষে দেখিয়া:— পরিষ্কার জ্যোৎস্না, তুমি রেল রাস্তার উপরে দাঁড়াইয়া আমার দিকে চাহিয়াছিলে—মনে নাই?"

পুলিন যেন পূর্ব্বের ঘটনা স্মরণ করিয়া বলিল—"ওঃ, তুমিই তাহা হইলে উলুবনের মধ্য হইতে মাথা তুলিয়াছিলে?"

"আমি তখন উঠিয়া দাঁড়াইতেছিলাম।"

হোঃ হোঃ শব্দে হাসিয়া পুলিন বলিল—"আমি কিন্তু তোমাকে তখন মানুষ মনে করি নাই, দস্তুরমত ভূত মনে করিয়া ভয় পাইয়াছিলাম।"

"তাহাও জানি, ভয় পাইয়া তুমি দৌড়াইয়া পলাইয়াছিলে।"

পুলিন মাথা দোলাইয়া হাসিতে হাসিতে তাহা স্বীকার করিল। পরে বলিল—"আচ্ছা, সেই উলুবনে—অমন সময়ে—পৃথিবীর কোন্ হিতে তুমি নিযুক্ত ছিলে?

"বিশ্বাস করিবে?—আমি চলন্ত-রেল হইতে পড়িয়া গিয়াছিলাম।"

"চলন্ত-রেল হইতে পড়িয়া গিয়াছিলে!"

বিস্ময়ে পুলিন আমার দিকে চাহিয়া রহিল, পরে বলিল—"কি সৌভাগ্য—মরিলে না!"

"সৌভাগ্য নয়—বরং দুর্ভাগ্য!"

কি চিন্তা করিয়া সে বলিল,—"এতক্ষণে মোকর্দ্দমার সমস্ত

ঘটনা বুঝিয়াছি—পরেশবাবু তোমাকেই গাড়ী হইতে ফেলিয়া দিয়াছিলেন।"

"লোকের ধারণা তাহাই বটে, কিন্তু আমি জানি—পরেশবাবু কিছুই করেন নাই।"

"পরেশবাবু বলিয়াছেন—মৃতার নাম হিরণ।"

"সে আমারই সাবেক নাম। বোধ হয় পরেশবাবু লাস দেখেন নাই, নিজে যাহা সত্য বলিয়া জানেন বিচারালয়ে তাহাই বলিয়াছেন, লাস দেখিবার সাহস বা প্রবৃত্তি তাঁহার হয় নাই! নতুবা সোণার লাস আমার বলিয়া প্রকাশ হইত না।"

পুলিন বলিল—"আর—দেখিলেও চিনিতে পারিতেন কি না সন্দেহ, সোণাকে দেখিতে যে অবিকল তোমারই মত ছিল।"

পুলিন যে এই ব্যাপারে আদৌ সংশ্লিষ্ট ছিল, তাহার সপ্রতিভ ভাবে তাহা বুঝা যায় না। কিছুকাল পরে আবার হাসিয়া প্রশ্ন করিল—"এতদিন পরে খুনের এই অতি মিষ্ট খোস্-খবরটা আজ হঠাৎ আমায় শোনান হইল কেন—জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

"স্বচ্ছন্দে;—যেহেতু—তুমি তোমার বিবাহের এই অতি মিষ্ট খোস্-খবরটা আমার কাছে গোপন রাখিয়াছিলে।"

"এখন কি করিবে—স্থির করিয়াছ?"

"পরেশবাবুর প্রাণ রক্ষা করিব।"

"অর্থাৎ যদি না আমি—, কি—সর্ত্তটা কি—বল ?"

তাহার কথার ভঙ্গিতে আমিও না হাসিয়া পারিলাম না, বলিলাম—"সর্ত্ত একটা অবশ্যই আছে, আমার মূল্যবান নীরবতার অবশ্যই একটা কিছু বিনিময় থাকা প্রয়োজন। কিন্তু সর্ত্তের কথা আর তুলিও না—ইহারই মধ্যে প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গিয়াছ ? তুমি জান না—আমি কি চাই ?"

"বল—কি করিতে হইবে।"

"তুমি যদি আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ কর, তখন তোমার প্রাণ রক্ষা, পরেশবাবুর প্রাণাপেক্ষা, আমার গুরুতর কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইবে।"

কিছুকাল মাথা নীচু করিয়া পুলিন কি ভাবিতে লাগিল। পরে ধীরে ধীরে বলিল—"তুমি কেন আমাকে চাহিতেছ—তোমার অভাব কিসের ?"

আমি বলিলাম—"আমি চাহিতেছি—না—তুমিই একদিন আমায় চাহিয়াছিলে ?

"তোমার উদ্দেশ্য কি ?"

"তোমার প্রাণ রক্ষা।"

"বাজে কথা ছাড়, আমিও মানুষ, বুদ্ধিহীন বা নির্জ্জীব নহি।"

"যদি বুদ্ধিমানই হও, তবে অবশ্যই বুঝিবে,—ইহার

দ্বিতীয় কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না—আমি যে তোমায় ভালবাসি। বলিবে—আমি তোমার অযোগ্যা? না—তাহাও নই; রমার ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার থাকিতে পারে, কিন্তু আমারও তাহা কম নাই। অবিশ্বাস হয়—চল দেখিবে।"

"দেখিতে হইবে না, হীরাবাঈকে কে না জানে? তোমাতে যে রূপ, গুণ ও ঐশ্বর্য্যের সমাবেশ রহিয়াছে, আমার অপেক্ষা অনেক যোগ্য ব্যক্তি তোমাকে পাইয়া কৃতার্থ হইবে।"

"সেই কৃতার্থের দিকে চাহিতে গেলে ত আর তোমার প্রাণরক্ষা হয় না?"

পুলিন হাসিয়া বলিল—"কিন্তু সকলেই জানে—তুমি মরিয়াছ, এখন প্রকাশ হইলে সকলেই তোমায় 'নকল হীরা' বলিবে।"

আমিও হাসিয়া বলিলাম—"ওঃ, সেই ভরসাতেই বুঝি আমায় এমন প্রবঞ্চনা করিতে সাহসী হইয়াছ? এ বোধ হয় তোমার ব্যারিষ্টারী বুদ্ধি! বেশ, তাহাই করিও, কিন্তু মনে রাখিও—প্রাণটী হাতে করিয়া এ খেলায় তোমায় নামিতে হইবে। কোন প্রকারে আমি 'আসল হীরা' প্রমাণ হইলে পরেশবাবুর পরিবর্ত্তে তোমাকেই ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে হইবে।"

ক্ষণিক মৌন থাকিয়া পুলিন বলিল—"আমার জন্য তোমার এত আগ্রহ কেন?"

"তুমি একদিন বলিয়াছিলে—আমরা দু'জনেই সমান—সমান অদৃষ্ট, সংসারে দু'জনেরই কেহ নাই, উভয়েই উভয়ের যোগ্য; সেই জন্য—তোমার সেই কথার যথার্থতা রক্ষার জন্য। শোন পুলিনবাবু! আর ঠাট্টা করিতেছি না, এই আমার শেষ কথা,—যদি তোমার বাঁচিয়া থাকিতে হয়—তবে চিরদিন একান্ত আমারই হইয়া থাকিতে হইবে; নতুবা নিশ্চয় জানিও—সকল কথা প্রকাশ করিয়া নির্দ্দোষী পরেশবাবুর প্রাণ রক্ষা করিব।"

এবার পুলিন মিনতির স্বরে বলিল—"কিন্তু রমাও যে আমায় বড় ভালবাসে, আমায় নিতান্ত নির্ভর করে!"

"সে কথা শুনিয়া আমার কি? বল—তুমি আমার হইবে কি না?"

"আমি বিপন্ন হইব, আমার সর্ব্বস্ব যাইবে, সমাজে মুখ দেখাইতে পারিব না।"

"সেই সর্ব্বস্ব আমি পূরণ করিব, সমাজের সম্মুখে হীরকের চশমা পরিয়া বাহির হইও—লজ্জা দূরে পলাইবে। শোন পুলিন-বাবু! আর বৃথা সময় নষ্ট করিব না। তুমি জান, কথায় যাহা বলিব—কার্য্যেও তাহা অবশ্য করিব। শীঘ্রই পরেশবাবুর বিচারের রায় বাহির হইবে। তোমার উত্তর না পাইলে নিশ্চয়ই তাঁহার প্রাণ রক্ষার আমি উপায় করিব। বেশ করিয়া ভাব—

প্রাণ দিবে—কি নিবে। তোমার উত্তর শুনিয়া আমি কর্ত্তব্যে অগ্রসর হইব।"

আমার এত কথা শুনিয়া পুলিন উচ্চৈঃস্বরে কেবল হাসিতে লাগিল, সে এমন হাসি যে আর থামিতে চাহে না! আমি বিস্মিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। অনেক চেষ্টায় হাসি থামাইয়া সে বলিল—"কিন্তু হীরা—এত কথা বলিলে, রমাকে বিবাহ করা সম্বন্ধে আমার নিজের কি মত, কৈ—তাহা ত একটী-বারও জিজ্ঞাসা করিলে না? ধরণীবাবু আমার মতের অপেক্ষা না করিয়াই বিবাহের আয়োজন করিতেছেন। কিন্তু তুমি স্থির জানিও—আমি এ বিবাহ করিব না, তুমি ভিন্ন আর কেহই আমার হৃদয়ে স্থান পাইবে না। রমা আমার উপর নির্ভর করে করুক, আমি তাহাকে চাহি না। এতক্ষণ আমি তোমায় পরীক্ষা করিতেছিলাম, এখন বুঝিলাম—তুমি আমায় প্রকৃতই ভালবাস, পৃথিবীতে একমাত্র তুমিই আমার যোগ্য। তোমার আজ প্রতি কথায় অন্তরে আমি যে আনন্দ অনুভব করিয়াছি, শত রমাও আমায় সে আনন্দ দিতে পারে না। এই আনন্দ গোপন করিয়া রাখা এতক্ষণ আমার পক্ষে যে কত কষ্ট-সাধ্য হইতেছিল, আমার বুকে না আসিলে হৃদয়ের সেই দ্রুত স্পন্দন তুমি বুঝিতে পারিবে না—এস হীরা"—বলিয়া সে আমাকে বুকে টানিয়া লইল। আমি যেন কি হইয়া

গেলাম, কি যেন যাদুমন্ত্রে সে আমায় জগত ভুলাইয়া দিল, কোন কথা বলিতে পারিলাম না ; কথা বলিবে কে ? আমি তখন আমাতে নাই—আরামের আবেশে অবশ হইয়া তাহার সেই স্পন্দিত হৃদয়ে পড়িয়া রহিলাম ।

গোপীকিষণের কথা।

(১৬)

আচ্ছা—লোকে আমায় নিন্দা করে কেন? বলে—এতকাল আইবুড় থাকিয়া এই বুড়বয়সে একটা ছুঁড়ীর জন্য পাগল হইয়াছি; তা'—আর কি কেহ হয় না? আমি তাহাকে শৈশব হইতে পালন করিয়াছি,—তাহাতে হইয়াছে কি? সেই যে রাস্তা হইতে কুড়াইয়া আনিয়া এত কষ্টে এত অর্থব্যয়ে লালন পালন করিয়া—এতটুকু হইতে এতবড়টী করিয়া তুলিলাম—সে কি পরের ভোগের জন্য? হায়রে নেমকহারাম মেয়েমানুষ-জাত! না হয়—নাই ভালবাস্‌তিস্‌, একটা মুখের কথায় একটু কৃতজ্ঞতা জানাইয়া যাইতেও পারিলি না? কেন—বুড়োর প্রাণটা কি প্রাণ নয়? সে প্রাণে কি প্রেম—ভালবাসা নাই? একবার আসিয়া দেখিয়া যা—এই বৃদ্ধ-প্রাণের শান্ত স্থির প্রেম-সমুদ্রে আজ কি তুমুল তুফান উঠিয়াছে! দেখিয়া যা—বৃদ্ধের সেই নীরস প্রাণ হইতে প্রেমের প্রস্রবণ ফুটিয়া উঠিয়া দু'নয়ন বহিয়া অবিরল ঝরিতেছে! এ বৃদ্ধের প্রবোধে ত বাধা মানে

না! ওরে, তোকে হারাইয়া আজ যে সত্যই আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, তুই যে ছিলি আমার যৌবন!

আমার এমন হইল কেন? অহরহঃ চক্ষের উপর রূপের ডালি লইয়া কত বালিকা চলিতেছে, সে মুখখানি ত কেহই ভুলাইতে পারিতেছে না! এই যে দীঘির চারিধারে শত শত পুষ্প সুগন্ধ ছড়াইতেছে—কই, সোণার দেহের আশৈশবের আঘ্রাণটুকু ত ভুলিতে পারিতেছি না! কত পাখীর গান শুনিয়াছি—তেমন কণ্ঠের কলরব ত আর কাণে আসে না!

এস সোণা—এস; তোমার কোমল কচি করপল্লব দু'খানি দিয়া আমার এই অশ্রুবিগলিত চক্ষু দুইটী চাপিয়া ধর, তোমার মধুময় কলহাস্যে আমার তপ্তপ্রাণ শীতল কর।

কি দোষে তুমি আমায় পরিত্যাগ করিলে—সোণা! আমি ত একদিনও তোমায় অযতন করি নাই, আমার অপেক্ষা তোমায় অধিক ভালবাসিতে আর কি কেহ পারিবে? আমি যে তোমায় কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছি।

সত্যই কি তুমি আমায় ভুলিয়া রহিয়াছ? তুমি ত এমন নিষ্ঠুর ছিলে না? সম্ভবতঃ কেহ তোমায় ভুলাইয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। যদি তাহাই হয়—আমি সমস্ত পৃথিবী খুঁজিয়া তোমায় বাহির করিব।

এত যন্ত্রণা আমায় তুমি কেন দিতেছ সোণা! আমায় এই

দুঃখ দিয়া তুমি কি সুখী হও? মনে কর, কোথায় বোম্বাই—আর কোথায় এই কলিকাতা সহর—রৌদ্র নাই—বৃষ্টি নাই—ইহার প্রত্যেক অলি গলি তোমায় খুঁজিয়া বেড়াইয়া নিরাশায় পাগল হইয়াছি, আর তুমি হয়ত কোন বিলাসী প্রণয়ীর প্রমোদ ভবন উজ্জ্বল করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া আছ! হা'রে অকৃতজ্ঞ বালিকা! যদি সুখী হইয়া থাক—ভাল, আমি ঈর্ষা করিব না, আমায়ও তোমার কাছে টানিয়া লও, আমি শুধু তোমায় প্রাণ ভরিয়া দেখিব—ভৃত্যের মত তোমার সেবা করিব।

নাঃ, আর চিন্তা করিতে পারি না; পাগল ত পূর্ব্বেই হইয়াছি, এইবার বুক ফাটিয়া মরিতে হইবে। তাহাই বুঝি অদৃষ্টে আছে—জীবিত থাকিতে আমি সোণার স্মৃতি ভুলিতে পারিব না! যাই—ঐ জনস্রোতে মিশিয়া দেখি—যদি কিছুকালের জন্য অন্যমনা হইতে পারি।

ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম। গোলদীঘির পশ্চিম দিকের ফটকের সম্মুখে একব্যক্তি খৃষ্ট-মাহাত্ম্য প্রচার কল্পে হাত পা নাড়িয়া দীর্ঘ বক্তৃতায় আসর জমাইয়া লইয়াছিলেন, ইতর ভদ্র বহুলোক তাঁহাকে ঘিরিয়া শুনিতেছিল। আমিও তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া সেই বক্তৃতা শুনিবার জন্য ভিড় ঠেলিয়া সম্মুখে গেলাম। কিন্তু বক্তা মহাশয়কে চিনিতে পারিয়া রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ কঠিন হইয়া উঠিল, অমনি ব্যাঘ্রলম্ফে নিকটবর্ত্তী

হইয়া তাহার শুষ্ক গণ্ডের একদিকে সজোরে এক বিরাট চপেটাঘাত করিলাম। সে কাত্‌ হইয়া পড়িয়া যাইতেছিল, আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধরিয়া, অপর গণ্ডের সামঞ্জস্য রক্ষার্থ দ্বিতীয় করোত্তোলন করিলাম, অমনি পশ্চাৎ হইতে কে আমার প্রসারিত হস্ত ধারণ করিয়া বলিল—"আহা-হা কর কি, মরিয়া যাইবে যে!"

আমি মুখ না ফিরাইয়াই বলিলাম—"হাত ছাড়,—এ জুয়াচোর।"

শ্রোতৃমণ্ডলমধ্যে ইতিপূর্ব্বেই মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল,ব্যাপার জানিবার জন্য সকলেই কলরব করিয়া সম্মুখে আসিতে ঠেলাঠেলি সুরু করিয়া দিল ; গোলযোগে—পুলিসের আবির্ভাব হইল। ফলে —আমরা উভয়েই নিকটস্থ মুচিপাড়া থানায় নীত হইলাম।

দারোগাসাহেবের দপ্তরে আমাদের এজাহার লেখা হইল। প্রহৃত বক্তার চতুরতায় পুলিস আগে তাহার এজাহারই লিখিল। সে বলিতে লাগিল—তাহার নাম মিষ্টার চিনিবাস, সে খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রচারক ; আমি বিধর্ম্মী—হিন্দু, তাহার প্রচার কার্য্যে বাধা দিয়া এবং বিনা কারণে তাহাকে প্রহার করিয়া গুরুতর অন্যায় করিয়াছি।

আমি বলিলাম—"এই ব্যক্তি মিথ্যা বলিতেছে, ইতিপূর্ব্বে গোয়েন্দা পরিচয় দিয়া একটী নিরুদ্দিষ্টা বালিকাকে খুঁজিয়া

বাহির করিবার জন্য আমার নিকট হইতে দুই শত টাকা ঠকাইয়া লইয়াছে; তৎপরে আর একদিন—মেয়েটীকে পাওয়া গিয়াছে—এইরূপ মিথ্যা বলিয়া তখনি তাহাকে আনিয়া দিবার খরচ বাবদ আরও দুই শত টাকা লইয়া গিয়াছিল। আমি সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু আমাকে দেখিলে পাছে সে না আসে—এইরূপ স্তোক বাক্যে আমায় নিরস্ত করিয়া যায়; তদবধি আর আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে না। দুই একবার হঠাৎ যদিও রাস্তায় দেখিতে পাইয়াছিলাম, দূর হইতে আমায় দেখিয়া পলাইয়া গিয়াছে, আজ বাছাধনকে হাতে পাইয়া রাগ সামলাইতে পারি নাই। টাকা ত পাইবই না,—রীতিমত শিক্ষা দিয়া হাতের সুখটা করিয়া লইতে দোষ কি?"

চিনিবাস আমার অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া পরিষ্কার বলিল—সে আমাকে চিনে না, কোনদিন দেখেও নাই। এমন ডাহা মিথ্যা কথায় আমি আর কি বলিব, মুখে বাক্য সরিল না, কোন সাক্ষী প্রমাণ ত রাখি নাই, সুতরাং দারোগার বিচারে চিনিবাসের মানহানির খেসারত স্বরূপ আক্কেল-সেলামী আরও একশত টাকা সম্মুখস্থ টেবিলের উপর রাখিয়া নিষ্কৃতিলাভ করিলাম। চিনিবাস আহ্লাদে হাত বাড়াইয়া যেমন টাকাটা লইতে যাইবে, অমনি দারোগা-সাহেব তাহাকে এক ভীষণ ধমক দিয়া বলিলেন—"সবুর কর;

তুমিই না হীরা-বাঈজীর খুনের মামলার প্রধান সাক্ষী? সেদিন আসামী পরেশবাবুর বিরুদ্ধে কোর্টে সাক্ষ্য দিয়াছিলে না?"

চিনিবাস অতি বিনীতভাবে নিবেদন করিল—"আজ্ঞে—হাঁ।"

দারোগাসাহেব বলিলেন—"ইঁহার কাছে বলিয়াছ—তুমি বে-সরকারী গোয়েন্দা, কোর্টে বলিয়াছ—মিসনারী ধর্ম্ম-প্রচারক, তোমার কোন্‌টা সত্য?"

সে বলিল—"আজ্ঞে দুইটাই সত্য।"

দারোগাসাহেব বলিলেন—"বটে! তবে আর কি—তুমি ত দেখিতেছি খুব রোজগারী, এই সামান্য টাকা কয়টাতে আর লোভ কেন?"

চিনিবাসের তখন মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল, বলিল—"বলেন কি! আমার মানহানি ও প্রহারের ক্ষতিপূরণ জন্যই ত এই টাকা আদায় করা হইল?"

দারোগাসাহেব রাগিয়া বলিলেন—"তা বই কি! পীরের কাছে মাম্‌দোবাজী! চিনিবাস—আমি যে তোমায় খুব ভাল রকমই চিনি। সে দিনকার 'চিনে ডোম' তুমি, আজ খৃষ্টান হইয়া—'মিষ্টার চিনিবাস' সাজিয়া—তোমার মান বাড়িয়াছে? কতবার জেল খাটিয়া আসিলে—ইহার মধ্যেই ভুলিয়া গিয়াছ? তোমরা অল্পেই ভুলিয়া যাও বটে, কিন্তু আমরা অত সহজে ভুলি না। ভাল চাও ত, আস্তে আস্তে সরিয়া পড়।"

দারোগাসাহেবের উক্ত উপদেশ অমান্য করিতে চিনিবাসের সাহসে কুলাইল না, এমন আকস্মিক হস্তগতপ্রায় লভ্যে বঞ্চিত ও মর্ম্মাহত হইয়া অতি বিষণ্ণ—বিরস বদনে ধীরে ধীরে সে বিদায় হইল।

দারোগাসাহেব টাকাগুলি যত্নের সহিত তুলিয়া দেখিয়া মৃদু হাসিতে হাসিতে পকেটস্থ করিতেছিলেন, আমি বলিলাম—"আরও দিব দারোগাসাহেব, যদি আমার সোণাকে খুঁজিয়া দিতে পারেন।"

তিনি মুখ তুলিয়া প্রসন্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিলেন। আমি আবার বলিলাম—"অনেক টাকা দিব—যত টাকা আপনি চাহেন—আমার সোণাকে খুঁজিয়া দিন।"

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই সোণাটী কে—আপনার কন্যা কি?"

আমি বলিলাম—"না না তা' হইবে কেন? সোণা আমার প্রাণ—আমার সর্ব্বস্ব।"

দারোগাসাহেবের বিশাল গুম্ফদ্বয়ের অন্তরালে ঈষৎ হাসির রেখা প্রকাশ হইল। তিনি বলিলেন—"কলিকাতায় যদি থাকে, অবশ্যই পারিব, নতুবা আমার সাধ্য নাই।"

"কলিকাতাতেই আছে, কোনও বাঙ্গালী তাহাকে ভুলাইয়া আনিয়াছে।"

"মেয়েটীর কোন ছবি আমায় দেখাইতে পারেন?"

"ফটো! তা—পারি বৈ কি, তাহার ছবিখানি যে আমি বুকে বুকেই রাখিয়াছি! যখন মন নিতান্ত খারাপ হয়, বাহির করিয়া খানিকক্ষণ দেখি!"

দারোগাসাহেব হাসিয়া আমার হাত হইতে ফটোটী লইয়া দেখিতে লাগিলেন। কিছুকাল ভালরূপ দেখিয়া ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ ছবি আপনি কোথায় পাইলেন—এ কাহার ছবি?"

আমি বলিলাম—"এই ত আমার সোণার ছবি!"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দারোগাসাহেব বলিলেন—"এ ছবি কত বৎসর আগে—কোথায় তোলা হইয়াছিল?"

"বেশীদিন নয়, বছরখানেক পূর্ব্বে বম্বেতে তোলা হইয়াছিল।"

"অসম্ভব।"

"কেন?"

"এ স্ত্রীলোক তখন কলিকাতায় ছিল।"

"না, আপনারই ভুল, দেড়বৎসর বয়স হইতে এই বালিকাকে আমি পালন করিয়াছি। গত ছয় মাস পূর্ব্বেও সে বম্বে ছাড়িয়া আর কোথাও যায় নাই।"

"আশ্চর্য্য—আমারই ভুল! কিন্তু এ মুখ ত একবার দেখিলে সহজে ভুলিবার নয়! আচ্ছা, ছবিখানি আজ আমার নিকট রহিল—আপনি কাল বৈকালে আসিবেন।"

"না—না, সে হইবে না, এ ছবি ছাড়িয়া একদণ্ডও আমি থাকিতে পারিব না, তাহা হইলে আমাকেও এইখানে থাকিতে হইবে—সে ব্যবস্থাও তবে করুন।"

দারোগাসাহেব উচ্চ হাসিয়া উঠিয়া ছবিটি আমায় ফিরাইয়া দিয়া পরদিন পুনরায় সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া দিলেন। আমি ও আশান্বিত হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে থানা হইতে বাহির হইলাম।

বড়রাস্তা ধরিয়া ভাবিতে ভাবিতে সটান চলিয়াছি—হঠাৎ পৃষ্ঠে সপাৎ শব্দে সজোরে কশাঘাত পাইয়া চমকিয়া উঠিলাম। পশ্চাতে চাহিয়া দেখি এক প্রকাণ্ড ওয়েলার ঘোড়ার মুখ—ঠিক আমার মাথার উপরে! তাড়াতাড়ি দৌড়াইয়া ফুটপথে উঠিলাম। অশ্বচালক গাড়ীর কোচবাক্স হইতে আমায় কশাঘাত করিয়াই সন্তুষ্ট হয় নাই, ইতর ভাষায় যথেচ্ছ গালি দিতে দিতে গাড়ী হাঁকাইয়া চলিয়া গেল। চাবুকের ইশারামাত্র শুনিয়া ঘোড়া যে কেন দ্রুত দৌড়ায়—সেদিন তাহা খুব ভালরূপ অনুভব করিলাম, আমার পিঠ জ্বলিয়া যাইতেছিল!

হায় সোণা! তোর মনে এত ছিল! এই ত অপঘাতে মরিতে বসিয়াছিলাম!

তখন ফুটপথ ধরিয়া সাবধানে চলিতেছি! পথের বাম দিকে একস্থানে ফুটপথ পৃথক করিয়া একটা ছোট গলি অল্পদূরে যাইয়া

একখানি সাদা দোতলা বাড়ী মাথায় লইয়া বন্ধ হইয়াছে। সেই দোতলার একটী জানালায় সহসা একখানি মুখ দেখিতে পাইয়া আমি থমকিয়া দাঁড়াইলাম! একি—ধাঁদা নয়ত! দূর হইতে যতদূর সম্ভব দেখিলাম—না, ভ্রম নয়, ঠিক—ঠিক্ সেই মুখ—নিশ্চয় আমার সোণা!

পৃষ্ঠের কশাঘাত-যন্ত্রণা আমি ভুলিয়া গেলাম। কিন্তু সে আর জানালায় দাঁড়াইল না, ভিতর হইতে সার্সি বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। আমি দৌড়াইয়া সেই বাড়ীর দরজায় গেলাম, ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিলাম না—দরজার বাহির দিকে বড় একটা তালা লাগান ছিল। তালা ধরিয়া অনেক টানাটানি করিলাম—খুলিল না, 'সোণা' 'সোণা' বলিয়া কত ডাকিলাম—কেহ কোন উত্তর দিল না। তখন ভাবিলাম—নিশ্চয়ই সোণাকে এখানে কেহ আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে—নতুবা সে কি আমায় ভুলিয়া থাকিতে পারে! কিন্তু কি করিব—আমি একা, দরজা বাহির হইতে তালাবদ্ধ। তদবস্থায় চীৎকার করিয়া গণ্ডগোল বাধাইলে, বাড়ীর ভিতরে যাহারা আছে—সাবধান হইবে, হয়ত সোণাকে আর পাইব না। সুতরাং দারোগাসাহেবের শরণ লওয়াই তখন উচিত মনে করিলাম, তাঁহার উপদেশ মত কার্য্য করিব ভাবিয়া উর্দ্ধশ্বাসে আবার থানার দিকে দৌড়াইলাম।

*   *   *   *

(১৭)

দারোগাসাহেব সমস্ত শুনিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"ঠিক দেখিয়াছেন?—পাগলামীর ঝোঁকে কিছু বলিতেছেন না ত?"

আমি বড় দুঃখে বলিলাম—"আপনিও পাগল বলিতে লাগিলেন—আমি কি সত্যই পাগল?"

"আহা—হা, চটেন কেন?"

"চটি কি সাধে? আমি খুব ভাল করিয়াই দেখিয়াছি, সেই—আমার সোণা।"

"যদি না হয়?"

"যত টাকা বলেন—বাজী রাখিতে প্রস্তুত আছি।"

দারোগাসাহেব পশ্চিম-দেশীয় সৌখিন মুসলমান ভদ্রলোক, আমায় তিনি বেশ উপভোগ করিতেছিলেন—তাহা বুঝিলাম। ছোটবাবু এবং জমাদারকে সঙ্গে লইয়া গোপনে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। আমার আর সবুর সহিল না, দারগাসাহেবের হাত ধরিয়া টানাটানি সুরু করিলাম। অবশেষে আশানুরূপ নগদ নজরানা এবং কার্য্যান্তে অবশিষ্ট দক্ষিণা প্রদানের অঙ্গীকারে সকলের পরিতুষ্টি ও উৎসাহ বাড়াইয়া—দারোগা, জমাদার এবং আরও দুই তিনজন কন্‌ষ্টেবল লইয়া আমি উৎফুল্ল

অন্তরে সেই বাড়ীর দিকে যাত্রা করিলাম। তখন সন্ধ্যার আলো রাস্তায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

গলির মোড়ে আসিয়া দারোগাসাহেব বলিলেন—"গোল করিও না—সাবধান, নিঃশব্দে অতি সন্তর্পণে একে একে বাটী প্রবেশ করিতে হইবে।" পরে আমাকেও দুই একটী প্রয়োজনীয় উপদেশ দিলেন।

জমাদারটী গুণবান ব্যক্তি, সে-ই অগ্রে গিয়া—কি কৌশলে জানি না—তালাটি খুলিয়া কপাট ফাঁক করিয়া আমাদের ইশারা করিল। পরামর্শ মত সকলেই ধীরে ধীরে পা টিপিয়া সেই অন্ধকার পুরীতে প্রবেশ করিলাম। আমার তখন মৃত্যুভয়ও ছিল না, পূর্ব্বে ত অশ্বক্ষুরাঘাতে মরিতেছিলাম—এবার না হয় সোণার জন্য একটা যুদ্ধ করিয়া অস্ত্রাঘাতেই মরিব।

উপরের মাত্র একখানি ঘরের দরজা খোলা, দরজায় পরদা, উজ্জ্বল আলোকে ঘরটি আলোকিত ছিল। জমাদার গুপ্ত আলোকে নিম্নের সমুদয় স্থান ও উপরে উঠিবার সিঁড়ি আমাদের দেখাইল। দারোগাকে পশ্চাতে লইয়া অতি সন্তর্পণে পা টিপিয়া উপরে উঠিলাম, জমাদার সিঁড়িতে, কনষ্টেবলেরা নিম্ন প্রাঙ্গনে, ফটকে ও রাস্তায় রহিল।

পর্দ্দার অন্তরাল হইতে দেখিলাম—ঘরটি বেশ পরিষ্কার এবং সজ্জিত; একদিকে শয্যা—অপর দিকে টেবিলের উপর বিদ্যুৎ

আলো জ্বলিতেছে, পার্শ্বে চেয়ারে বসিয়া মাথা নত করিয়া—পূর্ব্বে যাহাকে দেখিয়াছিলাম সেই বালিকাটী—আমার সোণা—কি যেন পত্রাদি পড়িতেছে—আর ভাবিতেছে। ঘরে অপর কেহ নাই, দারোগাসাহেব বাহিরে প্রচ্ছন্ন রহিলেন, আমি তাড়াতাড়ি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ডাকিলাম—"সোণা—আমার সোণা!"

ডাকিবামাত্র সে অতিশয় চমকিত হইয়া মুখ উঠাইল, আমি আবার বলিয়া উঠিলাম—"এই যে—এই যে আমার সোণা!"

আমায় দেখিয়া সে অমনি তাহার পারসী ওড়্‌নাখানি টানিয়া ঘোম্‌টা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কে আপনি?"

"সোণা! আমি যে তোমার গোপীকিষণ আসিয়াছি।"

"কে গোপীকিষণ—কোথায় আপনার নিবাস?"

"কেন—বম্বে!"

"এখানে কেন আসিয়াছেন?"

"সোণা! তুমি কি আমায় চিনিতে পারিতেছ না? তোমার গলার স্বরটীও যে ঠিক আমার মনে আছে!"

"বেশী চালাকী করিবেন না, আপনি কুলোক, কিরূপে এবাড়ী ঢুকিয়াছেন—কে আপনাকে দরজা খুলিয়া দিল?"

আমি দারোগার শিক্ষামত বলিলাম—"একটী ভদ্রলোকের সঙ্গে আমি আসিয়াছি। তিনি ফটকের তালা খুলিয়া দিয়া

আমাকে ভিতরে বসিবার জন্য বলিয়া চলিয়া গেলেন, এখনি আসিবেন।"

সে মনোযোগের সহিত আমার কথা শুনিতেছিল, আমি বলিলাম—"সোণা, আর কেন, ঘোম্‌টা খোল, আমার সঙ্গে চল।"

"মহাশয়, আমি আপনার সোণা নই—" বলিয়া অবগুণ্ঠনবতী মুখ ফিরাইল।

আমি হাসিয়া বলিলাম—"তুমি আমায় ঠকাইবে সোণা? তোমার পায়ের নখ হইতে মাথার চুলগাছটি পর্য্যন্ত আমি যে চিনি! পাত্‌লা ঘোম্‌টার মধ্যে তোমার উজ্জ্বল চক্ষুতারা দু'টী ঐ যে চক্ চক্ করিতেছে! লক্ষ্মি—ধন আমার! আমি যে তোমায় উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছি। কে সে দুষ্ট—তোমায় এখানে বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছে?"

"আপনি কি বলিতেছেন—কে আপনার সোণা?"

"আর ছলনা করিও না—ঘোমটা খোল; আজও আমি এমন পাগল হই নাই যে তোমায় চিনিব না। সোণা, এখানে তুমি কি সুখে আছ? আমার সঙ্গে যাইতে অমত করিতেছ কেন?"

"আপনি অল্পে অল্পে বিদায় হইবেন কি না?"

তাহার মুখের সেই নিষ্ঠুর কথা শুনিয়া আমার অন্তর পুড়িয়া যাইতে লাগিল, প্রায় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম—"বল কি

সোণা! দশমাসের অদর্শনে আঠার বছরের মায়া মমতা ভুলিয়া গেলে! তুমি কি আমার উপর রাগ করিয়াছ? কেন, আমি কি অপরাধ করিয়াছি? তুমি আমায় এমন ফাঁকি দিবে বুঝিতে পারিলে—কখনও কি তোমায় ছাড়িয়া টাকার লোভে রেঙ্গুন যাইতাম? কিসের জন্য টাকা—কাহার জন্য রোজগার করিব? যাহা আছে—এইবার সমস্ত বিলাইয়া দিয়া ফকির হইব। হায়রে দুরদৃষ্ট আমার!"

সে কথা কহিল না। আমি বলিতে লাগিলাম—"সোণা, ঘোমটা তুলিয়া একবার আমার পানে চাও, দেখ—তোমার শোকে পাগল হইয়া গিয়াছি—সে গোপীকিষণ আমি আর নাই। কেন আমায় চিনিতে পারিতেছ না? তোমায় কি কেহ যাদু করিয়াছে? বল না—কি হইয়াছে তোমার?"

"আমি আপনার সোণা নই, আপনি ভুল বকিতেছেন কেন?"

"তবুও প্রবঞ্চনা করিবে? ঐ যে দেওয়ালে তোমার ছবি রহিয়াছে?"

"ও ছবি আমার নয়।"

"তবে কাহার? আর আমায় যন্ত্রণা দিওনা, আর আমি সহ্য করিতে পারি না, পরীক্ষার কি এখনও বাকী আছে?"

"অনেকবার বলিয়াছি—আমি আপনার সোণা নই, সে কথা কি কাণে ঢুকিতেছে না?"

"বটে, এত অনুনয় বিনয় করিলাম, তথাপি তুমি কথার বাধ্য হইলে না? কত যত্নে খাওয়াইয়া পরাইয়া—লেখাপড়া গান বাজনা শিখাইয়া এত বড়টী করিলাম—শেষকালে এই প্রতিদান! এতটুকু চক্ষুলজ্জা তোমার নাই?"

"আপনি এখনি প্রস্থান করুন, নতুবা আপনার বিপদ হইবে, আমি লোক ডাকিব!"

"তাহা না করিয়া আমার বুকে একখানা ছুরি বসাইয়া দাও না—সকল যন্ত্রণার অবসান হউক।"

আমার কান্না পাইল, বলিতে লাগিলাম—"সোণা, আমার সঙ্গে যদি না যাও, তোমার পায়ের কাছে আমায় রাখিয়া দাও; শুধু তোমায় দেখিয়াই তুষ্ট থাকিব, দাস হইয়া তোমার সেবা করিব, আর কোন অনুগ্রহ চাহিব না; এ বয়সে আর আমায় কাঁদাইও না।"

"দেখিতেছি আপনি বৃদ্ধ, আপনার কি মাথা খারাপ?"

"তুমিও বলিতে সুরু করিলে—আমি পাগল? এইমাত্র তোমার মুখ দেখিয়াছি—তবুও তোমায় চিনিব না?"

"আপনি ভুল দেখিয়াছেন।"

"কখন না। দিবানিশি যাহার ছবিটি ধ্যান করিতেছি, সমস্ত পৃথিবী যাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি,—তাহাকে স্পষ্ট দেখিয়াও কি ভুল হইতে পারে? বেশ, তুমি ঘোমটাটি খোল, ভাল করিয়া আর একবার তোমায় দেখি, তারপর—"

"আমি স্ত্রীলোক—ভদ্রমহিলা; আপনি অপরিচিত পুরুষ, আমার কি লজ্জাধর্ম্ম নাই যে ঘোমটা খুলিব—বলেন কি?"

"হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ! সোণা! তোমার বয়স আঠার, আর আমার বয়স তিন কুড়ি,—তুমি আমায় ভুলাইবে? আমি যাইব না, তোমার পায়ের গোলাম হইয়া—তোমার লাথি খাইয়া এইখানে থাকিয়াই মরিব।"

"আচ্ছা, যদি আপনি বুঝিতে পারেন—সত্যই আমি আপনার সোণা নই—আমায় অব্যাহতি দিবেন ত?"

"তাহা হইলে এইদণ্ডেই চলিয়া যাইব, তুমি ঘোমটা খোল।"

"বেশ, তবে এই দেখুন—বলিয়া সে মুখের আবরণ খুলিল। আমি আনন্দে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলাম—"এই ত—এইত! এই ত আমার সোণা—তুমিই ত সোণা!"

"ভাল করিয়া দেখুন, তারপর আনন্দ করিবেন।"

আমি দেখিতে লাগিলাম—কিন্তু—কিন্তু—একি! কে—এ, এত সে সোণা নয়! অথচ ঠিক তাহারই মত—অবিকল যেন সে, সেই নাক, সেই চোক, সেইরূপই দুখানি পাতলা ঠোঁট, ঈষৎ যুগ্ম ভ্রু দুইটী সেইরূপই ধনুকের মত বাঁকা, সেইরূপই অলক্তকরাগ রঞ্জিত সুন্দর গৌর বর্ণ! কিন্তু একি—এই দশমাসে তাহাতে বিশ বৎসরের পরিবর্ত্তন ফুটাইয়া দিয়াছে—সোণার আমার এত বয়স ত ছিল না!

এই সময়ে দরজার পর্দ্দার দিকে চাহিয়া রমণী চকিতে আবার অবগুণ্ঠন টানিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বাহিরে আপনার কেহ সঙ্গী আছেন নাকি ?"

আমি বলিলাম—"না।"

"আমায় দেখিলেন ত ? তাহা হইলে দয়া করিয়া এখন আপনি বিদায় হউন।"

আমি যেন কেমন হইয়া গেলাম, ব্যাপার কি—কোন ইন্দ্রজাল কি না—কিছু বুঝিতে পারিলাম না, বলিলাম—"হ্যাঁ—যাই—যাইতেছি ; আমায় মাফ্ করুন, কিন্তু দেওয়ালে ঐ চেহারাখানি কাহার ?"

"আমারই অল্প বয়সের।"

"কিন্তু এমন সাদৃশ্য ত আর দেখি নাই !"

আমি ভগ্নমনে ফিরিয়া আসিব, সে অমনি বলিল—"মহাশয় ! জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি—এই সোণাটী আপনার কে হয় ?"

"কে—হয়, কেমন করিয়া বলিব—সে আমার কে হয় ! সোণা আমার প্রাণ, তাহাকে কুড়াইয়া পাইয়া দেড়বৎসর বয়স হইতে লালন পালন করিয়াছি, তাহাকে ভালবাসিয়াছি ; ভাবিয়াছিলাম —তাহাকে বিবাহ করিয়া—সংসারী হইয়া সুখী হইব, আমার আশার মাথায় বিধাতা বাজ হানিয়াছেন।"

আমার গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল। সহানুভূতি

দেখাইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—"এই সোণাকে আপনি কোথায় পাইয়াছিলেন ?"

"বোম্বাই সহরের ধোবীতলাও গলিতে।"

"সোণা কাহার কন্যা—আপনি জানেন ?"

"জানি, কিন্তু সে কথায় আপনার প্রয়োজন কি ?

"না বলিলে—সোণার সংবাদও আপনার অজানা রহিবে।"

"যঁ্যা—তাই নাকি—কোথায় সে ?"

"আগে বলুন—সে কাহার কন্যা ?"

"বোম্বাই নিবাসী কিশোরীলাল শ্রেষ্টীর।"

"যঁ্যা ! কিশোরীলালের ?"—বলিয়া সে যেন কাঁদিয়া ও কাঁপিয়া উঠিল, ক্ষণ পরে আবার জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কি মুন্নাবাই-এর নিকট এই বালিকাকে পাইয়াছিলেন ?"

"হঁা—হঁা—তাহাই বটে, মুন্না তাহার মৃত্যুর পুর্ব্বে এই দেড়-বছরের সোণাকে আর পাঁচ হাজার টাকার একখানি ব্যাঙ্কের বই আমার হাতে সমর্পণ করিয়া গিয়াছিল। কিন্তু মুন্নাকে তুমি কিরূপে জানিলে ?"

সে নির্ব্বাক হইয়া বিস্ফারিত নয়নে আমার দিকে চাহিয়াছিল ; ঘোমটা খুলিয়া পড়িয়াছে, দুই চক্ষু জলে ভরা, বুকের মধ্য হইতে যেন একটা অব্যক্ত বেদনা ও ক্রন্দনের ভাব জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। আমি বলিলাম—"ও কি

—ও কি! তুমি অমন করিতেছ কেন? আমার সোণাকে কি তুমি চিনিতে? কে তুমি?"

কম্পিত কণ্ঠে সে উত্তর করিল—"আমি—আমি? আমি সেই অভাগিনীর মা,—এই রাক্ষসীর গর্ভেই তোমার সোণার জন্ম হইয়াছিল।"

"সে কি! তুমিই কি তবে—সেই বাঙ্গালী বিবি—হিরণ কুমারী?"

"হাঁ, আমিই সেই হতভাগিনী। একটা ভুল—একটা ভুল—কিন্তু আজ আর চাপিয়া রাখিতে পারিতেছি না—বুক ফাটিয়া যাইতেছে—তাই আপনার পাপ আপনি ব্যক্ত করিতেছি; যৌবনের গর্ব্বে—সুখের নেশায়—স্বার্থের অন্ধকার কুহকে নিজের সন্তানকে নিজের ভোগপথের অন্তরায় ভাবিয়া প্রসবের পরেই পাঁচহাজার টাকাসহ মুন্নার হাতে বিদায় করিয়াছিলাম। মা হইয়া রাক্ষসীর কার্য্য করিয়াছি!"

"সত্যই বুঝি তুমি রাক্ষসী, নহিলে এমন সোণার পুতুলকে—আপন গর্ভের সদ্যোজাত শিশুকন্যাকে কোন্ প্রাণে পরিত্যাগ করিয়াছিলে? ছিঃ—ছিঃ!"

"আজ শতগুণে সেই বেদনা—সেই মাতৃত্ব আমার প্রাণে জাগিয়া উঠিয়া আমায় অধীর করিয়া তুলিয়াছে। পুলিনকে সে ভালবাসিত, প্রাণ দিয়া ভালবাসিত! ছিঃ ছিঃ—মা হইয়া যাহা

ধরণীবাবুর কথা।

(১৮)

ওকালতি করিয়া মাথার চুল পাকাইলাম, লোকে আমায় বিচক্ষণ বলিত, লোক চিনিতে নাকি আমার মত দ্বিতীয়টী কেহ ছিল না। আর বলিতে কি—আমিও তাহাতে বেশ একটু গর্ব্ব অনুভব করিতাম, তখন বুঝিতাম না—লোকচরিত্র অপেক্ষা দুর্জ্ঞেয় বিষয় পৃথিবীতে আর কিছুই নাই।

সেদিন রমার বিবাহ। আমার বড় আনন্দের দিন। বহুদিন হইতে সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিয়া আসিতেছিলাম।

গৃহিণীর বড় সাধ ছিল—রমার সঙ্গে পুলিনের বিবাহ দিয়া পুলিনকে গৃহে রাখিয়া পুত্রের অভাব দূর করিবেন। পুলিনকে দেখিয়া অবধি এই কামনা আমাদের অন্তরে জাগিয়াছিল। এখন আমার আসনে তাহাকে বসাইতে পারিলেই এই বৃদ্ধ বয়সে আমি নিশ্চিন্ত মনে পরলোকের পথের জন্য প্রস্তুত হইবার অবসর পাই।

আনন্দ আয়োজনের সাধ্যমত ত্রুটি করি নাই। আলোক ও পুষ্পমালায় আমার অট্টালিকা অমরাবতীর মত হাসিয়া উঠিয়াছে, তোরণদ্বারের উভয় পার্শ্বে মঙ্গল-ঘট স্থাপিত হইয়াছে, উপরে মিষ্ট সুরে নহবত বাজিতেছে। সমস্ত ভবন নিমন্ত্রিত আত্মীয় স্বজনের কলরবে মুখরিত।

আত্মীয়াগণ রমাকে—যে অঙ্গে যাহা মানায়—নানাবিধ মূল্যবান বসনভূষণে সজ্জিত করিয়া আমার সম্মুখে লইয়া আসিলেন। মা আমার লজ্জায় অবনতমুখী। সস্নেহে তাহার মুখখানি তুলিয়া দেখিতে দেখিতে মনে পড়িয়া গেল—আর একখানি মুখ! একদিন সে-মুখখানিও ঠিক এই রকমই দেখিয়াছিলাম! চক্ষের জল আর রাখিতে পারিলাম না, বাধা না মানিয়া দু'ফোঁটা গড়াইয়া পড়িল।

রমাও কাঁদিয়া ফেলিল, আত্মীয়াগণ তাহাকে লইয়া গেলেন। আমি একাকী বসিয়া তন্ময় হইয়া রমার স্বর্গগতা জননীকে ভাবিতে লাগিলাম; হায়—সে আজ কোথায়!

পুরোহিত মহাশয় আসিয়া লগ্ন সমুপস্থিত জানাইয়া আমায় সম্প্রদান-গৃহে লইয়া গেলেন। মঙ্গল-শঙ্খ ও নানাবিধ বাদ্য বাজিয়া উঠিল, পুষ্প ও সুগন্ধ বরিষণে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইল, এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের তরঙ্গে আমার অন্তর উদ্বেলিত করিয়া তুলিল। নারায়ণশিলার সম্মুখে দুই করে বরকন্যার দক্ষিণ কর

দুইখানি মিলিত করিবার মানসে যেমন তুলিয়া ধরিয়াছি—অমনি গৃহের দ্বারদেশে মস্ মস্ শব্দে স্বয়ং পুলিসসাহেব আসিয়া উপস্থিত!

বারাণ্ডা হইতে অভিবাদন করিয়া তিনি বলিলেন—"মিষ্টার সেন, অসময়ে এই শুভ কার্য্যে বাধা দিতে বাধ্য হইয়াছি—মার্জ্জন করিবেন, আমি কি গৃহমধ্যে যাইতে পারি?"

আমি অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া বলিলাম—"মাফ্ করিবেন, এখানে আমাদের দেবতা নারায়ণশিলা আছেন। আপনার প্রয়োজন কি?"

পুলিনকে দেখাইয়া তিনি বলিলেন—"আপনি কি এই ব্যক্তির সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতেছেন?"

"হাঁ,—কেন?"

"লোকটী কে—আপনি জানেন?"

"খুব জানি।"

"না, জানেন না, জানিলে একজন খুনী-আসামীর হাতে কন্যাদান করিতেন না।"

সমস্ত আকাশটা যেন আমার মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়িল, অতিশয় ভীত হইয়া বলিলাম—"এ্যাঁ! খুনী আসামী! না—না, আপনার ভুল হইয়াছে, কে বলিল আপনাকে—পুলিন খুনী-আসামী?"

এই সময় একজন স্ত্রীলোক ভিড় ঠেলিয়া পুলিস-সাহেবের

পার্শ্বে অগ্রসর হইয়া বলিল—"আমিই বলিয়াছি; এই পুলিনবাবু সোণানামে একটী অসহায়া বালিকাকে হত্যা করিয়াছেন।"

সহসা পুলিন উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"মিথ্যা কথা—তুমিই ত সেই সোণা।"

স্ত্রীলোকটী বলিল—"মিষ্টার পলিন ডট্! সোণার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করিয়া তাহাকে খুন করিতে পারিয়াছ বটে, কিন্তু সোণাকে যে গর্ভে ধরিয়াছিল—আমি সেই হীরাবাঈ, আমাকে প্রতারিত করা তোমার মত শত পুলিনেরও সাধ্য নয়।"

পুলিন আর বাক্যব্যয় না করিয়া চকিতের ন্যায় চঞ্চলপদে পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে চলিয়া গেল। পুলিসসাহেব বলিয়া উঠিলেন—"আসামী পলাইতেছে—মিষ্টার সেন, আমি গৃহপ্রবেশ করিব।"

"একটু অপেক্ষা করুন, একটু অপেক্ষা করুন"—বলিতে বলিতে আমি পুরোহিত মহাশয়কে শালগ্রাম লইয়া স্থানান্তর যাইতে ইঙ্গিত করিলাম।

"ব্যস্ত হইবেন না পুলিস-সাহেব, আমি পলাইব না—ধরা দিব"—বলিতে বলিতে পুলিন তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া—"হীরাবাই! মনে করিয়াছ—তুমিই জিতিবে?"—বলিয়া ক্ষিপ্রহস্তে আপনার বস্ত্রমধ্য হইতে লুক্কাইত পিস্তল বাহির করিয়া ভীষণ শব্দে সেই স্ত্রীলোকটীর বক্ষঃস্থলে গুলি করিল! ভয়ে ও বিস্ময়ে আমরা সকলে স্তম্ভিত হইয়া পড়িলাম। হীরার প্রাণহীন

দেহ রক্ত ছড়াইয়া গৃহদ্বারে পড়িয়া গেল। পুলিন অগ্রসর হইয়া হাতের পিস্তল পুলিস-সাহেবকে দিয়া বলিল—"কার্য্য শেষ, এইবার আমায় গ্রেফ্‌তার করুন।"

তৎক্ষণাৎ চারি পাঁচজন কন্‌ষ্টেবল আসিয়া পুলিনকে হাতকড়ি পরাইতে লাগিল। আমিও মস্তিষ্ক ঠিক রাখিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলাম।

কতক্ষণ পরে জানি না—যখন সংজ্ঞা লাভ করিলাম, চক্ষু মেলিয়া দেখিলাম—আমি শয়ন গৃহে শুইয়া আছি, কয়েকজন আত্মীয় ও অনুচর আমায় ঘিরিয়া আছে, রমা শিয়রে বসিয়া বাতাস করিতেছিল। ক্রমশঃ সমস্ত ঘটনা আমার মনে পড়িল। রমার তখনও বিবাহের বেশ। আমি "মা—মা" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। জনৈক প্রবীন আত্মীয় বলিলেন—"ধরণীবাবু! আপনি বিজ্ঞ ব্যক্তি, শোকে মুহ্যমান হইবেন না, এখনি অন্যপাত্র স্থির করিয়া রমার বিবাহ সম্পন্ন করিতে হইবে।"

আমি যন্ত্র চালিতের মত বলিতে লাগিলাম—"ঠিক কথা বিবাহ সম্পন্ন করিতে হইবে; রমা, চল্ মা, লগ্ন বহিয়া যায়।"

রমা তাহার বুকভরা ক্রন্দন বুকে চাপিয়া রাখিয়া ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া অতি গম্ভীর ও দৃঢ় স্বরে বলিল—"না—বাবা, আমি আর বিবাহ করিব না।"

রমার কথা।

(১৯)

তখন আমরা বৈদ্যনাথে। কাষ্টেয়ার্স-টাউনের একখানি ঝক্‌ঝকে একতলা বাড়ীতে বাবাকে লইয়া আছি। সেই ভীষণ দুর্ঘটনার পর হইতে বাবার শরীর ও মন এত ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল যে ডাক্তারগণ আর তাঁহার কলিকাতায় থাকা সঙ্গত ভাবিলেন না। বাবাও আর তিলার্দ্ধকাল কলিকাতায় থাকিতে চাহেন নাই।

সেখানকার জলবায়ুর গুণে ও প্রাকৃতিক দৃশ্যে বাবা দিন দিন ভাল হইয়া উঠিতে লাগিলেন। প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যায় উন্মুক্ত প্রান্তরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁকা বাঁকা স্রোতস্বিনী-তীরে, কোন দিন বা দূরস্থ অনুচ্চ পাহাড়ে তাঁহাকে লইয়া বেড়াইতে যাইতাম। বেশ বুঝিতে পারিতাম—বাবা তাঁহার নিজের মনঃকষ্ট গোপন করিয়া নানারূপ অদ্ভুত ও চিত্তাকর্ষক গল্পাদির অবতারণায় সর্ব্বদা আমায় ভুলাইয়া অন্যমনস্ক রাখিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার পূর্ব্বের সে গাম্ভীর্য্য আর ছিল না, আমার সঙ্গে বালকের মত খেলা করিতেন।

আমাদের পার্শ্বের বাড়ীতে একটী বড় সুখী পরিবার বায়ু

পরিবর্ত্তনের জন্য আসিয়াছিলেন। তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী মিলিয়া প্রত্যহ বেড়াইতে বাহির হইতেন, আর 'মীনা' নামে তাঁহাদের চারি বছরের সুন্দর কচি মেয়েটী আগে আগে দৌড়াইয়া—মায়ের মানা না মানিয়া—ছোট ছোট প্রজাপতির পশ্চাতে ছুটিয়া বেড়াইত।

তখন ফাল্গুন মাস। একদিন বৈকালে প্রায় চারিটার সময় বাবা বারাণ্ডায় বসিয়া আছেন, আমি তাঁহাকে চা প্রস্তুত করিয়া দিতেছি, এমন সময়ে মীনা একটী পলায়িত প্রজাপতির অনুসরণ করিয়া আমাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। বারাণ্ডার গায়ে লবঙ্গলতার ঘন পল্লব মধ্যে প্রজাপতিটী আশ্রয় লইয়াছিল. তাহাকে গ্রেফ্‌তার করা সাধ্যাতীত বুঝিয়া মীনা সপ্রতিভ ভাবে নিকটে আসিয়া আমার বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া বলিল—"আমায় ঐ প্রজাপতিটী ধরিয়া দাও না?"

বাবা অমনি সস্নেহে হাসিয়া বলিলেন—"আমি ধরিয়া দিব দিদি, আমার কাছে এস।"

মীনা বলিল—"প্রজাপতি যে পলাইয়া যাইবে!"

বাবা বলিলেন—"তোমায় এমন একটী সুন্দর প্রজাপতি আনিয়া দিব—যে কখনও পলাইতে পারিবে না; তুমি আমার কাছে বস, চা খাও, অনেক দিন চায়ের সঙ্গী জুটে নাই!"

মীনা বাবার সঙ্গে বসিয়া চা বিস্কুট খাইতেছে, সেই সময়ে তাহার মাতাপিতাও তাহার অনুসন্ধানে বিশেষ ব্যস্তভাবে আমাদের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে একটু ইতস্ততঃ করিয়া নিকটবর্ত্তী হইলেন। মীনা অমনি "বাবা আসিতেছেন" বলিয়া তাড়াতাড়ি পার্শ্বস্থ স্তম্ভের অন্তরালে গিয়া লুকাইল। মীনার পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখানে আমাদের মেয়েটি আসিযাছে ?"

মীনা আড়াল হইতে হাত নাড়িয়া অস্বীকার করিবার জন্য আমাদের ইশারা করিতে লাগিল।

বাবা আসন হইতে ঈষৎ উত্থিত হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"আসুন, আসুন—বসুন, অত ব্যস্ত কেন ?"

বাবার কথার মর্ম্ম তাঁহারা বুঝিতে পারিয়া আশ্বস্তভাবে টেবিলের নিকটে আসিয়া বসিতেছেন—মীনার তখন আর লুকাইয়া থাকা সম্ভব হইল না, ছোট একটী কু দিয়া হাসিতে হাসিতে দৌড়াইয়া গিয়া তাহার পিতার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল; সকলে হাসিয়া উঠিলাম।

মীনার মাকে আমি হাত ধরিয়া আনিয়া বসাইলাম। তাঁহার লজ্জা দেখিয়া বাবা বলিলেন—"আমায় লজ্জা করিও না না, আমি যে মীনার ভাই।"

বাবা আবার বলিতে লাগিলেন—"এমন প্রতিবেশী থাকিতে

—এমন দিদিটি কাছে থাকিতে এতদিন আমায় একলা দিন কাটাইতে হইয়াছে!"

মীনার পিতা তখন বলিলেন—"আপনার দিদি যে এতদিন পরিচয় করিয়া দেয় নাই, সেই জন্যই ত আসিতে পারি নাই।"

আমরা আবার হাসিয়া উঠিলাম, বাবাও হাসিয়া বলিলেন—"তা বটে, তা বটে!"

তদবধি প্রত্যহ একত্রে বেড়াইয়া ও গল্পাদি করিয়া দিনে দিনে আমাদের উভয় পরিবারের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, মীনার মা ইন্দুমতীর সহিত আমার বন্ধুত্ব হইল।

আহা—কেমন সুখী ইঁহারা! কিন্তু কোন্ পাপে—কাহার অভিশাপে আমার প্রতি নিয়তির এমন নিষ্ঠুর উপহাস!

কিছুদিন পরে ইন্দুরা কলিকাতায় চলিয়া গেল। সঙ্গীহীন হইয়া আমাদেরও আর বৈদ্যনাথ ভাল লাগিল না। আমার ইচ্ছা ছিল—এইবার বাবাকে লইয়া ভারতের পুরাণ ও ইতিহাস প্রসিদ্ধ এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সম্পন্ন স্থানগুলি দেখিয়া আসিব; বাবাও আমার সেই প্রস্তাবে খুব সন্তুষ্ট হইয়া সম্মত হইয়াছিলেন; কিন্তু বৈষয়িক দুই একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদনের জন্য আবার আমাদের কলিকাতায় ফিরিতে হইল।

* * * * * *

(২০)

বহুদিন হইতে ইচ্ছা করিয়াই সংবাদপত্র পড়িতাম না, বাবাও কাগজ লওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। হীরাবাঈজীর খুনের বিচারে আসামীর কি পরিণাম হইল—জানিবার জন্য যদিও একটা প্রবল আগ্রহ মনে মনে জাগ্রত ছিল, কিন্তু কাগজে সেই সংবাদ পড়িবার কিম্বা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবার সাহস আমার হইত না। তখন কি দারুণ উদ্বেগে—কি অব্যক্ত যন্ত্রণায় আমার দিন কাটিতেছিল—তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। বোধ হয় কারাগারে আবদ্ধ, প্রাণদণ্ড-ভয়-ভীত অপরাধীও এত উদ্বেগ, এত যন্ত্রণা ভোগ করে নাই।

এক একবার ভাবিতাম—এত দুশ্চিন্তা কেন? এত উদ্বেগ কাহার জন্য? আমার হইয়াছে কি? সে আমার কে? কিন্তু এ সকল প্রশ্নের কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইতাম না, বরং আরও অধিক যন্ত্রণায় বুক ভরিয়া উঠিত। যতই ভাবিতাম—সে আমার কেহ নয়, ততই দেখিতাম—সে ভিন্ন আমি কিছু নই!

একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাবার সঙ্গে মোটরে উঠিয়া বেড়াইতে যাইতেছি—ধর্ম্মতলার মোড়ে খবরের কাগজ বিক্রেতা হাঁকিল—

"হীরার খুনের বিচার হ'ল—
পলিন্ ডট্ ফাঁসি গেল।"

সংবাদটি শুনিবার জন্য যদিও পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইবার চেষ্টা করিতেছিলাম, কিন্তু শুনিবামাত্র বুকে বড় বাজিল, তীক্ষ্ণ অস্ত্রফলকে অন্তর যেন বিদ্ধ হইল; মনে পড়িল—শৈশবে যাহার সঙ্গে একত্রে খেলা করিয়াছি, কৈশোরে যাহাকে দাদার মত ভালবাসিয়াছি, যৌবনে যাহাকে স্বামী জ্ঞানে প্রেমপুষ্পে মনে মনে পূজা করিয়াছি—এ আমার সেই পুলিন-দা'। আমি সহ্য করিতে পারিলাম না—বাবার কোলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম।

আর বেড়ান হইল না, তখনই গাড়ী ফিরাইয়া বাড়ী আসিলাম। গাড়ীতে বসিয়া বাবা একটী কথাও কহেন নাই, বাড়ীতে আসিয়া আমাকে আমার ঘরে পৌছাইয়া দিলেন, আমি কৌচের উপর বসিয়া পড়িলাম। বাবা তখন গম্ভীরস্বরে বলিলেন—"রমা! যে ব্যক্তি খুনী—তাহার জন্য কোন মমতা রাখা উচিত নয়; সে মানুষ নয়—শয়তান, তাহার স্মৃতি মন হইতে মুছিয়া ফেল।"

ধীরে ধীরে তিনি সে ঘর হইতে চলিয়া গেলেন। আমি ভাবিলাম—হায়! বিচারালয়ে শত শত অপরাধীকে যিনি মরণের মুখে তুলিয়া দিয়াছেন—নারীর অন্তরের ব্যথা তিনি

কি বুঝিবেন ! এ স্মৃতি ত ভুলিবার নয়—জীবন থাকিতে ভুলিতে পারিব না।

তন্ময় হইয়া কত কি ভাবিতেছি, হঠাৎ কাণে আসিল—"দিদিমণি !"

চাহিয়া দেখিলাম—পরিচারিকা একখানি পত্র হস্তে দাঁড়াইয়া আছে। পত্রখানি হাতে লইয়া খুলিয়া পড়িলাম—

আছে—সে এখনও আছে—তবে ত শেষ দেখা দেখিতে পাইব ! সে-ও আমায় শেষ দেখা দেখিতে চাহিয়াছে। কিন্তু—উঃ—শেষ দেখা ! এ দেখা—না দেখাই ভাল। না—না, যাব ; তাহার এই শেষ চাওয়া—না দিয়া ত থাকিতে পারিব না !

পরিচারিকাকে বলিলাম—"রাত্রি শেষে আমার গাড়ীর প্রয়োজন হইবে, একজন দ্বারবান এবং তুমিও আমার সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত থাকিবে ; কিন্তু দেখিও—বাবা যেন জানিতে না পারেন।"

সমস্ত রাত্রি নিদ্রা আসিল না ; সময় যেন কাটিতেছিল না, ঘড়ীটাও যেন চলিতেছিল না, বাহিরে অন্ধকার রজনীও যেন বলিতেছিল না—সে আর প্রভাত হইবে। আহা—তাহাই যদি হইত ! সমস্ত জগতের ঘড়ী যদি চিরদিনের মত অচল হইত—কালিকার প্রাতঃসূর্য্য আর না ফুটিয়া একেবারে চির হিমান্ধকারে নিভিয়া যাইত !

কিন্তু, তাহা ত হইল না! দরজা খুলিবার শব্দ কাণে আসিল, মনে হইল—বুঝি কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া প্রহরী জানাইল 'সময় হইয়াছে।' চমকিয়া দেখিলাম—প্রহরী নয়, সে আমার পরিচারিকা।

সময় হইয়াছে?—হাঁ, তাহাই বটে! ঐ যে গাঢ় অন্ধকার পূর্ব্বগগনে স্বচ্ছ হইয়া যাইতেছে—শীঘ্রই সূর্য্যোদয় হইবে—সঙ্গে সঙ্গে অপরাধীরও জীবনপ্রদীপ চির-নির্ব্বাপিত হইবে!

আর বিলম্ব করিলাম না, সন্তর্পণে নামিয়া গিয়া মোটরে বসিলাম; মোটর গন্তব্যস্থানে পৌছিল।

জেলখানার ফটক হইতে কারাধ্যক্ষ আমায় একস্থানে লইয়া গেলেন; সেখানে এক ব্যক্তি নতমস্তকে বসিয়াছিল, আমাকে দেখিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল—আমি চিনিলাম।

বড় শান্ত দৃষ্টিতে—বড় কোমল স্বরে সে আমায় বলিল—"তুমি আসিয়াছ!—আমি আশা করি নাই!"

আমি কোন মতে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কেন?"

"চিরদিন যাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছ, আজ সে নারীহত্যা করিয়া ফাঁসি যাইতে চলিয়াছে, তাহার প্রতি তোমার দয়া হইবে কেন?"

"তোমার কার্য্যে আমি প্রশ্রয় দিই নাই সত্য, কিন্তু তোমায় আমি চিরদিন—"

"বল, বল রমা, চিরদিন কি—?"

"চিরদিন ভালবাসি।"

"ভালবাস? সত্যই ভালবাস?"—বলিয়া কি এক উদাস দৃষ্টিতে অন্তরীক্ষে চাহিয়া সে আবার বলিল—"ঐ যে, সে বলিতেছে—না, না, পৃথিবীতে ভালবাসা, প্রণয়, প্রেম—কিছুই নাই, প্রবঞ্চনা—সমস্তই প্রবঞ্চনা!"

তখনই কারাধ্যক্ষ আসিয়া শেষ সময় উপস্থিত জানাইলেন, সে-ও নিঃশব্দে তাঁহার সঙ্গে চলিয়া গেল। যাইতে যাইতে সে ফিরিয়া এমন ভাবে আমার দিকে চাহিল—আমার মাথা ঘুরিল, পা টলিল, অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলাম।

যখন জ্ঞান হইল, চারিদিকে চাহিয়া তাহাকে খুঁজিতে লাগিলাম; কিন্তু কই—সে ত নাই! তবে আর কাহাকে বুঝাইব—আমার এ প্রেম—না—প্রবঞ্চনা!!

সমাপ্ত।